বিপন্ন পৃথিবী

জল জলবায়ু ও জীবন

আজাদুর রহমান চন্দন

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

বিপন্ন পৃথিবী : জল জলবায়ু ও জীবন

আজাদুর রহমান চন্দন

প্রকাশক	:	কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৪
গ্রন্থস্বত্ব	:	লেখক
প্রচ্ছদ	:	সুমন
মুদ্রণ	:	মৌমিতা প্রিন্টার্স ঢাকা-১১০০।
দাম	:	১৮০.০০ টাকা

Endengered Earth, by Azadur Rahman Chandan
Publised by Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash
67 Paridas Road, Dhaka-1100
Date of Publication : February 2011, Copyright : Author
2nd Edition : February 2014
Cover Design : Sumon, Printer : Mowmita Printers, Dhaka-1100

Price : Tk. 180.00, US $ 5.00

ISBN : 984-70000-1066-8

দুনিয়ার সব
বনজীবী ও কৃষিজীবী
মানুষের প্রতি উৎসর্গ
যারা জীববৈচিত্র্য রক্ষার
সংগ্রামে নিয়োজিত

প্রসঙ্গ : বিপন্ন পৃথিবী

পরিবেশ বিপর্যয়ে দ্রুত বদলে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীর জলবায়ু। বহু বছর ধরে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ আর বনউজাড় চলতে থাকায় বাড়ছে ভূ-পৃষ্ঠ তথা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। এতে বরফ গলার হার বেড়েছে মেরু অঞ্চল ও হিমালয়ে। রুদ্র রূপ নিচ্ছে আবহওয়া, বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন এক্সট্রিম ওয়েদার। এ মুহূর্তে বেড়েছে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, খরা। কয়েক দশকের মধ্যে সাগরে তলিয়ে যেতে পারে অনেক দ্বীপরাষ্ট্রের নিম্নাঞ্চল। বিপর্যস্ত হতে বসেছে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি, মৎস্যসম্পদ, জীববৈচিত্র্যসহ মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবী নামের এই গ্রহের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হওয়ার মুখে।

পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কালের কণ্ঠ, সমকাল, মুক্তকণ্ঠ এবং উন্নয়ন বিষয়ক জার্নাল উন্নয়ন পদক্ষেপ-এ। পুরোনো লেখাগুলোর হালনাগাদ রূপ এবং আরো কয়েকটি নতুন লেখা নিয়ে এ বই। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের নানা তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে এতে। আছে পরিবেশ ও উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়েও একটি নিবন্ধ। কেন এবং কাদের জন্য এই পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন তাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ বইয়ে।

লেখার কাজ শেষ করে বইটি ছাপার জন্য দিয়েছিলাম ২০১০ সালের জানুয়ারিতে। সে বছর বইটি প্রকাশ করতে পারেননি প্রকাশক। এ বছর বইটি প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন জাতীয় সাহিত্য প্রকাশের মালিক বাবু কমলকান্তি দাস। যত্নের সঙ্গে বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন স্নেহভাজন শিল্পী সুমন। অনেক কৃতজ্ঞতা তার কাছেও।

আজাদুর রহমান চন্দন
ঢাকা

বিষয়ক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন : অদ্ভূত আঁধার এক	৯
বাতাসে বিষ	২৩
বজ্রে দূষণ, দূষণে বজ্র	৩৩
পানির অপর নাম মরণ	৩৯
বাঁধ মানেই মরণফাঁদ	৪৮
বিপন্ন পরিবেশ : দায়ী কে	৬৬
জীববৈচিত্র্য বিশ্বায়ন এবং গরিব মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন	৭৬
পরিবেশ ও উন্নয়ন : বিতর্কের দিন শেষ	৯৪
পরিবেশ ও উন্নয়ন : কোন্ অবস্থায় বাংলাদেশ	৯৮
অপার সম্ভাবনার হাওর অবহেলায় বিপর্যস্ত	১০৭

পরিশিষ্ট

কালপঞ্জি : জলবায়ু বদলের গুরত্বপূর্ণ ঘটনা, উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও রাজনৈতিক কর্মসূচি	১০৮
পরিভাষা	১২৫

জলবায়ু পরিবর্তন : অদ্ভূত আঁধার এক

পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছরের মতো। স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর আরো ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর টিকে থাকার কথা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই সময়ে সূর্য তার সব হাইড্রোজেন জ্বালানি নিঃশেষ করে ফেলে প্রসারিত হবে এবং পৃথিবীসহ তার চারপাশের সব গ্রহকে ভস্মীভূত করে দেবে। অন্যদিকে মানুষের তৈরি পরমাণু অস্ত্র যে কোনো সময় ধ্বংস করে দিতে পারে পৃথিবীকে। এই দুই চরম পরিণতির সুতোয় ঝুলছে পৃথিবীর আয়ু। তবে এ দুটি সম্ভাব্য পরিণতির বাইরে আশু একটি ঝুঁকি মানবজাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে এরইমধ্যে। ঝুঁকিটি হলো জলবায়ু পরিবর্তনের।

এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালের। একেবারে নিখুঁত হিসাব পাওয়া না গেলেও ধরে নেওয়া হয় ইতিহাসটা ৩০-৪০ লাখ বছরের। ১৮০০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ছিল ১০০ কোটির মতো। এরপর গত কয়েক শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাতিয়ার নিয়ে মানুষ শক্তিশালী হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মহামারী নিয়ন্ত্রণে আসছে এবং কমছে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার, তেমনি মানুষের বংশবৃদ্ধির গতিও হয়েছে দ্রুততর। গত একশ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে মানুষের গড় আয়ু। বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০০ কোটি ছাড়িয়েছে আগেই। শিল্পায়ন আর নগরায়নও বাড়ছে খুব দ্রুত হারে। দুনিয়ার অনেক দেশেই কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে, নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে জীবনে। অন্যদিকে এই অতি সাফল্য আর দ্রুত বংশবৃদ্ধি পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জন্য রীতিমতো হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমেই বিপর্যয়ের দিকে এগুচ্ছে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ। বাতাস, মাটি, পানি সবই দূষিত হচ্ছে সীমাহীনভাবে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। কেননা এর ফলে পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু। মেরু অঞ্চলের হিমবাহ ও হিমালয়চূড়ার বরফগলার মাত্রা যাচ্ছে বেড়ে। স্ফীত হচ্ছে সমুদ্রের উপরিতল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। অঞ্চলভেদে খরা ও বন্যায় ফসলহানিসহ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপক। ফলন কমে যাচ্ছে ফসলের। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। পরিবর্তন ঘটছে সুপেয় পানির প্রাপ্যতার। কোনো কোনো দেশের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

হিমালয়ের বরফ গলার হার বাড়ায় এ মুহূর্তে দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যা বেড়েছে। আগামী কয়েক বছরে তা আরো বাড়বে। ঘটবে ফসলহানি। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবে। লবণাক্ততা বাড়বে। পাল্টে যাবে কৃষি উৎপাদনের ধরন। বাস্তুহারা হবে বহু কোটি মানুষ। কিন্তু হিমালয়ের বরফ গলে শেষ হয়ে যাওয়ার পর পানির অভাবে মরে যাবে এ অঞ্চলের নদীগুলো। শুরু হবে মরুকরণ।

পিলে চমকানোর মতো একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে বিবিসি। সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ২০০৯ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বিবিসি জানায়, আর্কটিক বা উত্তর মেরুতে তাপমাত্রা এখন গত দুই হাজার বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ওই অঞ্চলের বরফখণ্ড, হ্রদের তলদেশ ও গাছ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, একশ বছর আগেও উত্তর মেরুতে তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু একশ বছর আগে থেকে সেখানে বাড়তে শুরু করে তাপমাত্রা। ভূ-পৃষ্ঠের এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানীরা দায়ী করছেন মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকে।

বার্তা সংস্থা এএফপি ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর এক খবরে জানায়, দক্ষিণ মহাসাগরে দ্বীপের সমান একটি monster iceberg বা দৈত্যাকার হিমশৈল ভেঙে কয়েকশ টুকরো হয়ে এখন তা অস্ট্রেলীয় উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্টার্কটিকা থেকে ধেয়ে আসা ওই হিমশৈলের আকার ১৪০ বর্গকিলোমিটার। সে বছরের ৯ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে হিমশৈলটিকে এক হাজার ৭০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করতে দেখা গেছে। এ অবস্থায় ওই এলাকায় জাহাজ চলাচলে সতর্কতা জারি করেছিল অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্টার্কটিক ডিভিশনের (দক্ষিণ মেরু বিষয়ক বিভাগ) হিমবাহ বিশেষজ্ঞ নিল ইয়ং নাসার উপগ্রহচিত্র এবং ইউরোপীয় মহাকাশ এজেন্সির সহায়তায় বি-১৭-বি নামের ওই হিমশৈল শনাক্ত করেন। নিল বলেন, যখন অ্যান্টার্কটিকা থেকে হিমশৈলটি বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এর আকৃতি ছিল ৪০০ বর্গকিলোমিটার, আর উচ্চতা ছিল ৪০ মিটার। এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে দক্ষিণ মহাসাগরের দিকে চলে আসে। নিল আরো বলেন, হিমশৈলটির অনেকটা ভেঙে ও গলে গেছে। ওই হিমশৈলের শত শত খণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে মহাসাগরের কয়েক হাজার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে। একসময় হিমশৈলটি পুরোপুরি গলে যাবে। উষ্ণতা বাড়ার কারণেই এমনটা ঘটছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই নির্গমন ঘটে গ্রিনহাউস গ্যাসের, যা উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে সায়েন্স জার্নালে কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী লিখেছিলেন, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সানস্পট বা ভলকানোর মতো প্রাকৃতিক কোনো কারণ নেই; বরং মানুষই এর

জন্য দায়ী। একই জার্নালে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, গ্রিনহাউসের প্রভাব ও সৌর উষ্ণায়ন দুটোর প্রতিই উত্তর মেরুর আবহাওয়া যথেষ্ট সংবেদনশীল, সেখানে উষ্ণতা বৃদ্ধির ঘটনা এটাই নিশ্চিত করেছে। গবেষণায় ২৩টি এলাকার তাপমাত্রার চিত্র দশকওয়ারি ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, গত দশকে অর্থাৎ ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত উত্তর মেরুর তাপমাত্রা ছিল সবচেয়ে বেশি। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রতি সহস্রাব্দে উত্তর মেরুর তাপমাত্রা কমেছে গড়ে দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস করে। কিন্তু এর পর থেকে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। গবেষক দলের সদস্য আরিজোনা ইউনিভার্সিটির নিকোলাস ম্যাককেই বলেন, বিশ শতকেই প্রথম সূর্যের বাইরের অন্য তাপ-উৎস উত্তর মেরুর তাপমাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হওয়ার পর তখনকার জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেন, জলবায়ু গবেষকরা যেসব বিষয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন, তার অনেক কিছুই এখন ঘটতে শুরু করেছে। প্রায় একই সময়ে জেনেভায় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) নির্বাহী পরিচালক আচিম স্টেইনার বলেন, 'আমাদের ধারণার চেয়েও দ্রুতগতিতে ও ব্যাপক আকারে বিশ্বের উষ্ণায়ন ঘটে চলেছে।'

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) একটি অপ্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ২০১১ সালের ২৯ মে ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ২০১০ সালে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বেশি কার্বন গ্যাস নিঃসরণ করেছে পৃথিবীর মানুষ। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচার পথ ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। আইইএর তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে রেকর্ড ৩০ দশমিক ৬ গিগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মিশেছে, যা ২০০৯ সালের চেয়ে ১ দশমিক ৬ গিগাটন বেশি। আর এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। আইইএর প্রধান অর্থনীতিবিদ ফাতিহ বিরোল বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার যে পরিকল্পনার কথা বলে আসছিলেন বিজ্ঞানীরা, ২০১০ সালের তথ্য পাওয়ার পর মনে হচ্ছে, এটা কেবলই একটি সুন্দর স্বপ্ন। তার মতে, ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে বিশ্ব ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে পড়লেও গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর এর প্রভাব পড়েছে সামান্যই। বিরোল গার্ডিয়ানকে বলেন, 'আমি দারুণ শঙ্কিত। কার্বন গ্যাস নিঃসরণের বিষয়ে এটাই সবচেয়ে খারাপ খবর। এরপর উষ্ণতা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমি সামনে

অন্ধকার দেখছি।' লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকসের অধ্যাপক লর্ড স্টার্ন বলেন, এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।

২০১০ সালে ব্রিটিশ আবহাওয়া দপ্তর জানায়, ১৬০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ বছর হতে পারে ২০১০ সাল। মানুষের কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনই এ জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করে সংস্থাটি। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্য টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ধারণা করা হচ্ছে ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যকার বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার চেয়ে ২০১০ সালে তাপমাত্রা প্রায় ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হবে। আর বার্ষিক গড় তাপমাত্রা হবে ১৪ দশমিক ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাপ শোষণকারী মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন যৌগ, ওজোন প্রভৃতি উপাদানই মূলত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। জীবাশ্ম জ্বালানি দহন এবং জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এসব উপাদান যুক্ত হচ্ছে বাতাসে। শিল্প-কারখানা ও যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়ায়ও এসব উপাদান থাকে। এ ছাড়া শিল্পবর্জ্য মাটির রাসায়নিক সংযুতি ভেঙে দিয়ে ফসফরাস, নাইট্রোজেন, সালফার প্রভৃতি উপাদানকে ফিরে আসতে সাহায্য করছে বাতাসে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। কিন্তু এর পরিণামস্বরূপ বদলে যাচ্ছে গোটা বিশ্বের জলবায়ু। আর তা মানুষসহ জীবজগতকে ঠেলে দিচ্ছে প্রচণ্ড ঝুঁকির মুখে। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা অক্সফামের প্রকাশ করা এক রিপোর্টে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বে ৪৫ লাখ শিশুর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

পরিবেশবিষয়ক সংগঠন ওয়ার্ল্ডওয়াচ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, সে বছরের প্রথম ১১ মাসে আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সারাবিশ্বে কমপক্ষে ৮,৯০০ কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয়। ওই দুর্যোগে মানুষের ওপর যে-সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা ছিল ভয়াবহ। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকৃতির ওপর মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে এ সময়ে আনুমানিক ৩২ হাজার লোক মারা যায় এবং কমপক্ষে ৩০ কোটি লোক ছিন্নমূল হয় অথবা তাদের ঘরবাড়ি নতুন করে বানাতে হয়। ওয়ার্ল্ডওয়াচ আরো জানায়, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়েছিল। রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ১০ হাজার মাইল। ধান উৎপাদন কম হয়েছিল ২০ লাখ টন। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং সমুদ্রের পানির স্তর বাড়ার কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আরো বেশি বন্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ওই বছরই নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (ডাব্লিউডাব্লিউএফ) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা এবং

আবহাওয়ার চূড়ান্ত পরিবর্তন বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা বাড়িয়েছে। আগে সংক্রমিত হয়নি এমন এলাকায়ও এসব রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলে ও অস্ট্রেলিয়ায় এরইমধ্যে ডেঙ্গু জ্বরের সংক্রমণ ঘটেছে। এশিয়ায় নিয়মিত এ রোগ দেখা দিচ্ছে কয়েক বছর ধরেই।

গবেষকদের আশঙ্কা, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে গ্রীষ্মকালীন রোগ বাড়বে। বিশেষ করে বাড়বে হেপাটাইটিস-বি, সংক্রামক সেরিব্রাল, মেনিনজাইটিস পোলিও, কলেরা ইত্যাদি। এ ছাড়া সূর্যের বিকিরণ করা অতিবেগুনি রশ্মির অনুপ্রবেশ বাড়ার কারণে ত্বকের ক্যান্সার ও চোখের ছানিপড়া রোগ বাড়বে। এমনকি খাদ্যশস্যে তেজস্ক্রিয়তাও বেড়ে যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)। এর পর থেকে জাতিসংঘের আওতায় কাজ করছে এ প্যানেল। প্রতিষ্ঠার পর এই প্যানেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো না গেলে একুশ শতকের প্রতি দশকে পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.২ থেকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৩ থেকে ১০ সেন্টিমিটার।

২০০৭ সালে প্রকাশিত আইপিসিসি প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ১৮ থেকে ৫৯ সেন্টিমিটার। কিন্তু এ ধারণা নাকচ করে অতি সম্প্রতি আরো উদ্বেগজনক তথ্য দিয়েছে আর্কটিক মনিটরিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম। সংস্থাটি জানিয়েছে, আসলে ওই সময় নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে আইপিসিসির পূর্বাভাসের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ ০.৫ থেকে ১.৬ মিটার। কোপেনহেগেনে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে নতুন এ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয় ২০০৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর। প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকার আইস শিট বা বরফখণ্ড গলে যাওয়ার বিষয়টি ভূমিকা রাখবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে। এ বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের সম্ভাব্য উচ্চতা বৃদ্ধির হিসাব করেছিল আইপিসিসি।[১]

একই সময়ে আরেকটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি) এবং ইউএনইপি ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন মনিটরিং সেন্টার (ইউএনইপি-ডাব্লিউসিএমসি)। এতে বলা হয়, ২০৫০ সালের মধ্যে সাগরে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাবে ১৫০ শতাংশ।

১. Alister Doyle, 'Seas could rise up to 1.6 meters by 2100: study', Reuters, May 3, 2011

আর এ সময়ে সাগরে অ্যাসিডিটি বা অম্লতা বাড়ার গতি হবে গত দুই কোটি বছরের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি দ্রুত। এর ফলে সাগরের জীববৈচিত্র্য ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলন–কোপ ১৫-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে ওই সমীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বন উজাড় ও মানবসৃষ্ট অন্যান্য কারণে বায়ুমণ্ডলে নির্গত কার্বনের প্রায় এক-চতুর্থাংশই সাগর ও মহাসাগরে শোষিত হয়। দিনের পর দিন বায়ুমণ্ডলে নির্গত কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ যেমন বেড়েছে, তেমনি এর সঙ্গে দ্রুতগতিতে বেড়েছে সাগর ও মহাসাগরের কার্বন শোষণের মাত্রা। এভাবে যদি সাগরের পানিতে কার্বন শোষণের ব্যাপারটি না ঘটত, তবে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের মাত্রা অনেক বেশি হতো, যা জলবায়ু পরিবর্তনকে আরো অনেক বেশি ত্বরান্বিত করত। তবে এভাবে কার্বন শোষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে সাগরের পানিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে পানিতে অম্লতা-ক্ষারত্ব অনুপাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে সাগরে অ্যাসিডের পরিমাণ আগের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি দ্রুত এবং এখনকার চেয়ে ১৫০ শতাংশ বেড়ে যাবে। আর এমনটি ঘটলে পুরো ব্যাপারটি এত কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে যে, সাগরের জীবজগত সেই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময়টুকু পর্যন্ত পাবে না, যার ফলে হুমকির মুখে পড়বে এর জীববৈচিত্র্য। বলা হচ্ছে, সাগরের অম্লায়ন এবং এর ফলে সেখানে জীবজগতের মৌলিক বিপর্যয় একটি অপরিবর্তনশীল ব্যাপার; অর্থাৎ একবার অম্লতা বেড়ে গেলে এবং সাগরের জৈবব্যবস্থার মূলে ক্ষতি সাধিত হয়ে গেলে সেটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অন্তত কয়েক লাখ বছরের মধ্যে সম্ভব নয়। তাই এমন অবস্থার প্রতিকার হিসেবে উচিত বিশ্বে কার্বন নির্গমনের মাত্রা এখনই কমিয়ে আনা। এজন্য বিষয়টি নিয়ে কোপেনহেগেন জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলনে জোরালো আলোচনা চালানো উচিত বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩০০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক লেখার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমীক্ষাটি করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, অম্লতা বাড়ার আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হলে সাগরের পরিবেশ একেবারেই প্রতিকূল হয়ে উঠবে। এতে ২১০০ সালের মধ্যে সামুদ্রিক মাছের খাদ্যের মূল উৎস ঠাণ্ডা পানির প্রবাল শতকরা ৭০ ভাগই নিঃশেষ হয়ে যাবে।[২]

জলবায়ু পরিবর্তন যে-মানবজাতির জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনছে সে বিষয়ে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায় ২০১০ সালের শেষ দিকে কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু

২. Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Acidification on Marine Biodiversity, CBD & UNEP-WCMC 2009

সম্মেলনের আলোচনায়ও। তখনকার জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন সম্মেলনে বলেন, 'আমাদের সামনে আরেকটি বছর অপেক্ষা করার সময় নেই। প্রকৃতি কাউকে এতটুকু ছাড় দেয় না।' ফ্রান্সের তখনকার প্রেসিডেন্ট নিকোলা সারকোজি বলেন, 'সময় ফুরিয়ে আসছে। আসুন আমরা প্রবঞ্চনা বন্ধ করি। কোপেনহেগেন সম্মেলন ব্যর্থ হলে তা আমাদের সবার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।'

সম্মেলন চলাকালেই মধ্য ডিসেম্বরে ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে শুরু হয় প্রচণ্ড তুষারঝড়। দুই সপ্তাহের তুষারঝড়ে ইউরোপে মারা যায় দুই শতাধিক মানুষ। এদের মধ্যে অনেকেই বরফে জমে মারা যায় পোলান্ডে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তুষারপাত, ভারী বর্ষণ ও তীব্র ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে তিন দিন বন্ধ থাকে ইউরোস্টার রেল পরিষেবা। বন্ধ হয়ে যায় ইউরোপের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট। তুষারঝড়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শুধু একটি বিমানবন্দরেই বাতিল করা হয় প্রায় দুই শ ফ্লাইট। ফ্লাইটের উড্ডয়ন বিলম্বিত হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। লিভারপুল বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ব্যাপক তুষারপাতের কারণে ইতালির মিলানের মালফেনসো বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্ব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ও'হারে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাতিল করা হয় প্রায় দুই শ ফ্লাইট। এতে বিমানবন্দরে আটকা পড়ে কয়েক হাজার যাত্রী। শহরের অন্য একটি বিমানবন্দরেও ৬০টির মতো ফ্লাইট বাতিল করা হয়। আবহাওয়াবিদরা তখন জানান, এ ধরনের তুষারপাতের ঘটনা অস্বাভাবিক এবং পূর্ববর্তী ৩০ বছরের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলা তুষারপাত এটি।

সে বছর বড়দিনের আনন্দময় মুহূর্তেও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে হানা দেয় তুষারঝড়। এর ফলে টেক্সাস থেকে মিনেসোটা পর্যন্ত সড়ক ও বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাতিল করা হয় ১০০টি ফ্লাইট। অনেক গির্জায় বড়দিনের অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়। বরফাচ্ছন্ন রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিহত হয় কমপক্ষে ১৮ জন। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া দপ্তর জানায়, তুষারঝড়ের কারণে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা অচল হয়ে পড়ে। জরুরি দরকার ছাড়া জনগণকে ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়। দক্ষিণ ডাকোটা, টেক্সাস ও ওকলাহোমায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। আটকে পড়া ভ্রমণকারীদের উদ্ধারের জন্য ন্যাশনাল গার্ডের সেনাদের ডেকে পাঠানো হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রচণ্ড তুষারঝড় জলবায়ু পরিবর্তনেরই পরিণাম।

আইপিসিসির ২০০৭ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে। পৃথিবীর শুকনোভাবাপন্ন এলাকাগুলো চাষের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

১৯৯০ সালের তুলনায় গড় তাপমাত্রা ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্যের ৩০ শতাংশ হারিয়ে যেতে পারে। নানা ধরনের সমস্যা ছড়িয়ে পড়তে পারে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায়, ইউরোপ থেকে আফ্রিকায়। আফ্রিকা মহাদেশে পানি স্বল্পতার সংকটে পড়বে ২৫ কোটি মানুষ। সেখানে ব্যাপকভাবে কমে যাবে খাদ্য উৎপাদন। অন্যদিকে এশিয়ার বন্যাপ্রবণ এলাকায় তীব্র হবে বন্যার মাত্রা, হিমালয়ের তুষারঢাকা চূড়া ও হিমবাহ থেকে বরফগলা বাড়বে। ফলে যেসব নদী হিমালয়ের বরফগলা পানিতে এখনো বহমান, সেগুলো শীর্ণ হয়ে যাবে। বেড়ে যাবে বরফধস ও ভূমিধস। সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়বে আফ্রিকা মহাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া।

এসব তো হলো পূর্বাভাস। কিন্তু বর্তমানেই আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ করছি আবহাওয়ার বৈরী আচরণ এবং এর কারণে সৃষ্ট নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ২০১১ সালের ২৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় সাতটি অঙ্গরাজ্যে আঘাত হানে ভয়াবহ টর্নেডো। এতে তিন শতাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। আহত হয় প্রায় দুই হাজার মানুষ। শুধু আলাবামা অঙ্গরাজ্যেই নিহত হয় কমপক্ষে ২০৪ জন। আর সাত অঙ্গরাজ্যে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় পড়ে প্রায় ১০ লাখ মানুষ। টর্নেডো-বিধ্বস্ত এলাকায় অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। জঞ্জাল সাফ করাসহ উদ্ধারকাজে নামতে হয় সেনাবাহিনীকেও। ঝড়ের পরদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় আলাবামা, জর্জিয়া, আরকানসাস, মিসিসিপি, টেনেসি, লুইজিয়ানা ও ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে ঘোষণা করা হয় জরুরি অবস্থা। ১৯৭৪ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোতে এত বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ওটাই প্রথম। সে সময় নিহত হয়েছিল ৩১০ জন। ২০১১ সালের ২২ মে মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের জপলিন শহরে টর্নেডোর আঘাতে ১২২ জনের প্রাণহানি ঘটে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ওই শহরের বেশিরভাগ এলাকা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওই এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ২০০৫ সালে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্রে। ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় লাখ লাখ মানুষ। সে বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়, মানবজাতি খুব ঘন ঘন প্রকৃতির ভয়ঙ্কর শক্তি প্রত্যক্ষ করছে। ২০০৪ সালে ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছিল চারটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। এ বছর (২০০৫ সাল) ক্যাটরিনার রেশ কাটতে না কাটতেই আঘাত হেনেছে রিটা। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে নিউ অরলিন্স ও মিসিসিপি এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ক্যাটরিনায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২০,০০০ কোটি ডলার।[৩]

যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন রিটার ছোবল চলাকালেই ভারত ও বাংলাদেশেও নামে

৩. New Era of Violent Weather, New York Times, September 25, 2005

প্রবল বর্ষণ। ভারতের মুম্বাই নগরী এবং আশপাশের এলাকা সয়লাব হয়ে যায় বৃষ্টির পানিতে। বর্ষণজনিত বন্যায় প্রাণ হারায় সহস্রাধিক মানুষ। অচল হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাত। সে বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যে-ভারি বর্ষণ হয় তাকে রেকর্ড হিসেবে উল্লেখ করে আবহাওয়া বিভাগ। ওই বৃষ্টির কারণে ১০ লাখ মানুষ পানিবন্দী ছিল প্রায় ছয় ঘণ্টা। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুনামি আঘাত হেনেছিল ইন্দোনেশিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাসহ ১১টি দেশে। ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্ট ভূমিকম্পের প্রভাবে ১০০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছিল উপকূলভাগে। এতে প্রাণহানি ঘটেছিল ২ লাখ ৩০ হাজার লোকের। শুধু ইন্দোনেশিয়ায়ই মারা গিয়েছিল দেড় লাখের বেশি মানুষ। ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভারতে ১৬ লাখ ৬৩ হাজারের বেশি লোক আশ্রয় হারিয়েছিল। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে পরপর দুবছর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল বাংলাদেশ। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে ৯ ঘণ্টার সুপার সাইক্লোন বা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং ২০ থেকে ২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৮২ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ১৫ লাখ ঘরবাড়ি। ভেসে গিয়েছিল ১০ লাখ গবাদিপশু। এরপর ১৯৯৮ সালে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় তলিয়ে গিয়েছিল দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা। এতে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ২৬ লাখ। নষ্ট হয়েছিল প্রায় ৭,৭৪৭ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৪,৮৫৫ কিলোমিটার স্থানীয় ও মিউনিসিপাল রাস্তা। রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৫০০ কিলোমিটার। ক্ষতিগ্রস্ত রেলসেতুর সংখ্যা ছিল ১৩০। মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১০,২২৮ কোটি টাকা। ২০০৪ সালে দেখা দেয় আরেকটি মাঝারি বন্যা। দেশের ৩৮টি জেলা তাতে কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাণহানি ঘটে ৬৩৮ জনের। ওই বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই সে বছরের মধ্য সেপ্টেম্বরের টানা বর্ষণ কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। ওই সময় ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় তিন দিন নৌকাই ছিল যাতায়াতের প্রধান বাহন। ২০০৭ সালে একটি বিলম্বিত বন্যার পরপরই আঘাত হানে সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। ওই বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী সিডরে প্রাণহানি ঘটে ৩২৬৮ জনের। জাতিসংঘের হিসাব মতে, সিডরে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা ২ লাখ। বনবিভাগের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ওই ঘূর্ণিঝড়ে শুধু সুন্দরবনের ক্ষতির পরিমাণ ১৪৫ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১০১৫ কোটি টাকা। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'র আঘাতে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ওই সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় ৫৫ শতাংশ চিংড়িঘের ও ৮ হাজার মৎস্য-খামার, যাতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে আবহাওয়ার এলোমেলো গতিপ্রকৃতি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ২০০৩ সালের বর্ষাকাল স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ছাড়াই চলে যাওয়ার পর শীত মৌসুমের শুরুতেই হঠাৎ করে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল অস্বাভাবিক পর্যায়ে। সে বছর ডিসেম্বর মাসেও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল একটি ঘূর্ণিঝড়। ৬০ বছর পর এমন ঘটনা ঘটেছিল। এরপর একটি শৈত্যপ্রবাহ ছাড়া ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল, যাকে স্বাভাবিক শীতকাল বলেন না আবহাওয়াবিদরা।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রবাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার ফলে সামনের বছরগুলোতেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। ২০০৯ সালের নভেম্বরে ডাব্লিউডাব্লিউএফ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নাজুক অবস্থায় থাকা এশিয়ার বড় শহরগুলোর মধ্যে শীর্ষে আছে ঢাকা। ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি ঢাকার। ঝুঁকির ক্ষেত্রে ঢাকার পরই রয়েছে ম্যানিলা ও জাকার্তা। সংস্থাটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রচারিত ওই প্রতিবেদনে পরিবেশগত পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক সংবেদনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শহরগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা কম, অন্যদিকে সার্বিক ঝুঁকি অনেক বেশি। ডাব্লিউডাব্লিউএফ-এর প্রধান কিম কারস্টেনসেন বলেছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশের বড় শহরগুলোতে এরইমধ্যে ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে। তিনি আরো বলেন, এসব শহরের কোটি কোটি বাসিন্দা ও বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং জিডিপিতে তাদের অবদান রক্ষা করতে খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।[৪]

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলনেও (৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯) সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি আলোচিত হয় বার বার। কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘ প্যানেলের (আইপিসিসি) সভাপতি রাজেন্দ্র কুমার পাচৌরি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এক গবেষণায় জানা যায়, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্র উপরিতলের স্ফীতি ঘটবে বর্তমানের তুলনায় যথাক্রমে ১৪ ও ৩২ সেন্টিমিটার। ২১০০ সাল নাগাদ তা আরো বেড়ে দাঁড়াবে ৮৮ সেন্টিমিটার। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়বে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোনো

৪. Mega-stress for mega-cities: a climate vulnerability ranking of major coastal cities in Asia, wwf, November, 2009.

কোনো উপকূলীয় বাঁধের ভেতরে দেখা দেবে লবণ-পানির জলাবদ্ধতা।[৫] আরেক গবেষণায় দেখা যায়, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে স্থানীয় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়বে ১৪৪ সেন্টিমিটার। তাতে দেশের ১৬ শতাংশ জমি তলিয়ে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১৩ শতাংশ মানুষ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফসিহউদ্দিন মাহতাবের ওই গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে সমুদ্র-উপরিতল স্ফীতির সম্ভাব্য পরিমাণ ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১.৫ মিটার। তার মতে, বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৩.৭৪ শতাংশ আবাদি জমি আর ২৮.২৯ শতাংশ বনভূমি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে বাস্তুহারা হবে এক কোটি মানুষ।

গবেষকদের আশঙ্কা, সমুদ্র-উপরিতল স্ফীত হলে দেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চল আরো বেশি মাত্রায় প্লাবিত হবে। বর্ষা মৌসুমে বাড়বে বৃষ্টিপাত। বাড়বে নদীর পানির উচ্চতা। এতে বন্যার প্রকোপ বাড়বে। অন্যদিকে শুকনো মৌসুমে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ কমে যাবে। উত্তরাঞ্চলে দেখা দেবে মরুকরণ। সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লবণাক্ততা বাড়াবে। ফলে বিপর্যস্ত হবে কৃষি। প্রভাব পড়বে মৎস্যসম্পদের ওপরও। নষ্ট হবে জীববৈচিত্র্য। ঘন ঘন সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মানুষের প্রাণহানিসহ ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে। এসবের আলামত এরইমধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে। 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব : মরে যাচ্ছে প্যারাবনের কেওড়া-বাইনগাছ' শিরোনামে ২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীর তীরে উপকূলীয় বন বিভাগের গড়া প্যারাবনের লাখ লাখ কেওড়া ও বাইনগাছ মরে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সাগর ও নদীর পানি এবং মাটিতে লবণাক্ততা, একই সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ায় গাছপালার মৃত্যু ঘটছে। এতে বনাঞ্চলের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য।' সে বছরের ১০ ডিসেম্বর সকালে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ, সাবরাং, নয়াপাড়া, জালিয়াপাড়া, নাইটংপাড়া, নাজিরপাড়া, স্থলবন্দর উপকূল ঘুরে প্রথম আলোর প্রতিবেদকরা দেখতে পান, বন বিভাগের বিশাল প্যারাবন বিবর্ণ হয়ে গেছে। গাছগুলোও মরে শুকিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কয়েকজন লোককে এসব গাছ কেটে নিয়ে যেতে দেখা যায়। বনে সবুজ পাতা নেই বললেই চলে। ২ ডিসেম্বর থেকে এ মড়ক দেখা যাচ্ছে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ সূত্রের বরাত দিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, প্যারাবনে গাছের মড়ক ১১ ডিসেম্বর (২০০৯) পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক লাখের বেশি গাছ মরে গেছে বলে আশঙ্কা করা হয়। উপকূলীয়

৫. আরভিসি, ২০০৩ এবং সিইজিআইএস, ২০০৬

এলাকার লাখ লাখ মানুষের জানমাল ও সম্পদ রক্ষার জন্য এই প্যারাবন গড়ে তুলেছিল সরকার। উপকূলীয় বন বিভাগ টেকনাফ রেঞ্জের কর্মকর্তা কোশ কুমার বৈদ্য প্রতিবেদকদের জানান, উপজেলায় হোয়াইক্যং থেকে শাহপরীর দ্বীপ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ কিলোমিটারে বন বিভাগের প্রায় ৭০০ একরের প্যারাবন রয়েছে। ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে এই বন সৃষ্টি করা হয়। বনে আট থেকে ২৫ ফুট উঁচু ছয়-সাত লাখ কেওড়া ও বাইনগাছ রয়েছে। এর মধ্যে ৬০ ভাগ কেওড়া গাছ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে নদীর পানি ও মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় গাছগুলো বিবর্ণ হয়ে মারা যাচ্ছে। কোশ কুমার বৈদ্য আরো জানান, নরম ও পলি মাটিতে বাইন এবং আরেকটু শক্ত মাটিতে কেওড়াগাছ জন্মে। কিন্তু জোয়ারের পানি গাছের গোড়ায় না আসার ফলে মাটি শক্ত হচ্ছে। এতে মাটিতে লবণের পরিমাণও বাড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পুরো উপকূলে প্যারাবন টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, প্যারাবনের বাইরে হোয়াইক্যং থেকে সাবরাং পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ কিলোমিটারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধের পাশে বিশাল এলাকায় ২০০৮ সালেও ৫০টির বেশি ঘেরে চিংড়ি চাষ হয়েছে। এবার সব ঘেরে চিংড়ি চাষ বন্ধ রয়েছে। ঘেরগুলোর মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে। টেকনাফের ঘেরমালিক ও চিংড়িচাষি আব্দুল গফুর শরীফ ও মো. ইলিয়াছ বলেন, 'নাফ নদীর নাজিরপাড়া এলাকার প্যারাবনের পাশে আমরা এক যুগের বেশি সময় ধরে ঘেরে চিংড়ি চাষ করে আসছি। পরিবেশ অনুকূলে থাকায় অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে চিংড়ির উৎপাদনও ভালো হতো। কিন্তু চলতি মৌসুমে ঘের করা সম্ভব হয়নি। কারণ নাফ নদী থেকে লবণাক্ত পানি ঘেরে ঢোকানো হলেও তা শুকিয়ে যায়। এতে পাঁচ হাজার একরের বেশি জমিতে চিংড়ি চাষ বন্ধ রয়েছে।'

নাফ নদ তীরবর্তী ১০ হাজার একরের মতো জমিতে প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লবণ উৎপাদিত হতো। ২০০৯ সালে তা বন্ধ ছিল। টেকনাফের লবণচাষি সিরাজুল ইসলাম ও ছৈয়দ আলমকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, আগে লবণমাঠে লোনা পানি ঢুকিয়ে পাঁচ-সাত দিন রাখা হতো। ওই পানি রোদে শুকিয়ে লবণ তৈরি হতো। আর এখন সকালে পানি ঢোকালে বিকেলে তা শুকিয়ে যায়। লবণ তৈরি হয় সামান্য। লবণের মানও ভালো নয়। কৃষি বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমন হচ্ছে। কৃষি জমিতেও লবণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করেও চাষিরা আগের মতো ফসল উৎপাদন করতে পারছেন না। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃষ্টি কমে যাওয়ায় সাগর ও নদীর পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। পাশাপাশি

উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় ধ্বংস হচ্ছে বনাঞ্চল। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততা ক্রমেই গ্রাস করছে উপকূলীয় প্যারাবন।

বছর বছর বন্যা-জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণে বিশ্বের সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের আয়তন কমে যাচ্ছে। কমছে সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণির সংখ্যা। একশ বছর আগেও সুন্দরবনের আয়তন ছিল ১০ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯৫ সালের জরিপে দেখা যায়, এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৭৭৩ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে তা ৪ হাজার বর্গকিলোমিটারেরও নিচে নেমে এসেছে। সুন্দরী গাছের সংখ্যা কমে গেছে অর্ধেকের বেশি। ১৯৯৪ সালের এক জরিপে জানা যায়, অন্তত ৫ কোটি সুন্দরী গাছ তখন মারাত্মক top dying (আগামরা) রোগে আক্রান্ত। কমে যাচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও হরিণের সংখ্যাও। ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (ওডিএ) ১৯৮৫ সালের জরিপ অনুযায়ী তখন সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৪৫০। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ১৯৯৪ সালের জরিপে বাঘের সংখ্যা মেলে ২৬০। চিত্রল হরিণ পাওয়া যায় মাত্র ৬০ হাজার, যা আগে ছিল ৮০ হাজার। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির টার্টমাউথ ক্যাম্পাস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এ সমীক্ষায় জানা যায়, সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি ও মোহনার জলের তাপমাত্রা প্রতি দশকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়ছে। সুন্দরবনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই হার বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের গড় হারের আট গুণ বেশি। সুন্দরবনে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব কতটা তা যাচাই করতে গবেষকরা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, অম্ল-ক্ষারের আনুপাতিক মাত্রা, জলের মান ও স্বচ্ছতা নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষায় তারা দেখতে পেয়েছেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে জলজ প্রাণিরা।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ২০১২ সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দশকে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্যোগকবলিত হবে যেসব দেশ সেগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগরতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম গরম এবং আরও বেশি সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে মানুষের জীবন, খাদ্য উৎপাদন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি হুমকির মুখে পড়বে। ২০১৩ সালের ১৯ জুন প্রকাশিত ওই রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ হচ্ছে হট স্পট বা সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ

অঞ্চল। আগামী শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে আবহাওয়ার সব নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে। দেশটিতে বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবচেয়ে বেশি আঘাত হানবে। এরই মধ্যে পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

ওই গবেষণা রিপোর্টটি তৈরি করা হয় জার্মানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পস্টড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চের নেতৃত্বে। বিশ্বের খ্যাতনামা ৯০ জন জলবায়ু-বিশেষজ্ঞ রিপোর্টটি মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রিপোর্টের মূল সুর হচ্ছে, বিশ্বে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৯০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব হতে পারে তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এতে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কোনো দূর অতীতের বিষয় নয়। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশে দেশে এর প্রভাব এরইমধ্যে পড়তে শুরু করেছে।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকায় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আগের চেয়ে ঘন ঘন আঘাত হানবে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে বাংলাদেশের ৩৪ লাখ ৫০ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ডুবে গিয়েছিল। ওই ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৬০ কোটি ডলার বা ১২,৪৮০ কোটি টাকা। ২০৫০ সালের মধ্যে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে তিন মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে উপকূলে আঘাত হানবে। এতে ৯০ লাখ মানুষের বাড়িঘর ডুবে যেতে পারে। প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছর পর বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যায় ডুবে যাবে। এতে ফসলের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি গরিব মানুষের ঘরবাড়ি বিপন্ন হবে। তাপমাত্রা আড়াই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণ বাড়বে ২৯ শতাংশ। বন্যার সময় আগের চেয়ে বেশি উচ্চতা নিয়ে পানি প্রবাহিত হবে। এতে প্রধান ফসল বোরো ও আমনের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপকূলীয় এলাকায় এরইমধ্যে লবণাক্ততা বাড়ার কারণে দুই কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বেড়ে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে উঠবে। ফলে ওই এলাকাগুলোতে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে। মৌসুমি বৃষ্টিপাত কমবে, খরা বাড়বে, বেড়ে যাবে তাপদাহের পরিমাণ। ২০৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৬৫ সেন্টিমিটার বাড়লে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪০ শতাংশ ফসলি জমি হারিয়ে যাবে।[৬]

৬. Turn Down The Heat: Climate Extremes, Regional Impacts and the Case for Resilience, The World Bank report 2012

বাতাসে বিষ

বায়ু দূষণকারী বিষাক্ত ধোঁয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাংশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ২০০৫ সালের আগস্টে। কুয়াশার মতো এ ধোঁয়ার কারণে তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওই অঞ্চলের স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বায়ুদূষণের নানা কারণের মধ্যে ধোঁয়া অন্যতম। শুধু ধোঁয়াজনিত বায়ুদূষণ প্রতি বছর এশিয়ার লক্ষাধিক মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের বড় শহরগুলো বায়ুদূষণের কারণে বর্তমানে মারাত্মক হুমকির মুখে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুদূষণ প্রতি বছর এ অঞ্চলের প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার বনাঞ্চলে সৃষ্ট আগুনের ওই ধোঁয়ায় সে বছর মালয়েশিয়ার পরিবেশও হুমকির মুখে পড়েছিল। মালয়েশিয়ার সরকার তখন এ কারণে রাজধানী কুয়ালালামপুরের বাইরে দুটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য হয়েছিল। এ ছাড়া থাইল্যান্ডের কয়েকটি অঞ্চলও তখন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ধোঁয়ায়। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে শুকনো মৌসুমে অবৈধভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য যে-আগুন লাগানো হয়ে থাকে, ওই ধোঁয়ার জন্য তাকেই দায়ী করা হয়। প্রায় প্রতি বছরই ঘটছে এ রকম ঘটনা। ১৯৯৭-৯৮ সালে ওই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ধোঁয়া সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় ওই অঞ্চলের অনেক দেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল হালকা ধোঁয়ায়।

'তাপমাত্রা ওঠাপড়ার সঙ্গে ধোঁয়াশা, বাড়ছে শ্বাসরোগ' শিরোনামে ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'উত্তুরে হাওয়ার জোর কমেছে। কমেছে রোদের তীব্রতাও। সকালে কুয়াশা থাকছে। সন্ধ্যায় মেঘের আনাগোনা বাড়ায় দীর্ঘক্ষণ জমে থাকছে ধোঁয়াশা। তাপমাত্রার নামা-ওঠাই শুধু নয়, মাটির কাছাকাছি জমে থাকা ধোঁয়াশাটা চিকিৎসকদের কাছে রীতিমতো ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' জীবাণু বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, 'ওই ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে ধূলিকণা, গাড়ির ধোঁয়া। আর রয়েছে অসংখ্য রোগের জীবাণু। যা তাপমাত্রার ওঠানামায় সক্রিয় হয়ে ওঠে।'

শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য ধোঁয়া খুবই বিপজ্জনক। শুধু তা-ই নয়, ধোঁয়ার কারণে সুস্থ মানুষের মধ্যেও ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। মালয়েশিয়ার

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট সমস্যা বেড়েছে শতকরা ১৫০ ভাগ। বায়ুদূষণ যে শুধু বনাঞ্চলে লাগানো আগুনের ধোঁয়ার কারণেই ঘটছে তা নয়, যানবাহন ও শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়াও এর জন্য দায়ী। বায়ু দূষণকারী উপাদানগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে কার্বন-যৌগ, যেমন–কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি। এ ছাড়া নাইট্রোজেন ও সালফার যৌগও বায়ুদূষণ ঘটায়। তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভূমিকাই এক্ষেত্রে প্রধান।

প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষসহ সব প্রাণি নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয় বায়ুমণ্ডলে। অন্যদিকে গাছপালা টেনে নেয় তাপ শোষণকারী ওই গ্যাস আর বিনিময়ে ছেড়ে দেয় প্রচুর অক্সিজেন, যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। এ নিয়মেই এতকাল বজায় ছিল পরিবেশের ভারসাম্য। এমনিতেই বিশ্বে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তার উপর শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করতে শুরু করে ব্যাপকভাবে। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, জ্বালানি ও কৃষিজমির জন্য উজাড় করে ফেলা হচ্ছে বন। নগরায়ন ও শিল্পায়নে খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত হারে। অসংখ্য কারখানার চিমনি চারপাশের বাতাসে ছড়াচ্ছে ক্ষতিকর বিভিন্ন গ্যাস।

যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স ২০১৪ (বৈশ্বিক পরিবেশ সাফল্যসূচক ২০১৪)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশের মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান নবম। আর বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বাংলাদেশের। অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ হচ্ছে বাংলাদেশে। সার্বিকভাবে দূষিত দেশের তালিকায় মাত্র চার বছরে বাংলাদেশের ৩০ ধাপ অবনমন ঘটেছে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা প্রতিবছর এই বৈশ্বিক সূচক প্রকাশ করেন। সূচকটি তৈরি করা হয় জনস্বাস্থ্যের ওপর দূষণের প্রভাব, বায়ু পরিস্থিতি, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন, পানিসম্পদ, কৃষি, বনায়ন, মৎস্যসম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও বাসস্থান এবং আবহাওয়া ও জ্বালানি–এসব বিষয় বিবেচনা করে। ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত সূচকে দেখা গেছে, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ হচ্ছে সোমালিয়া। আর সবচেয়ে ভালো দেশ সুইজ্যারল্যান্ড। সবচেয়ে দূষিত শহর হচ্ছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি। দূষিত দেশের তালিকায় বিশ্বের ১৭৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৯, অর্থাৎ নবম। অথচ ১০ বছর আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৯-এ। আর বায়ুদূষণের দিক দিয়ে বিশ্বের ১৭৮টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ।

বায়ুদূষণের একটি অন্যতম উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড। এটি সবচেয়ে বেশি নির্গত হয় শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকেই নির্গত হয় মোট কার্বন ডাই-অক্সাইডের শতকরা ২৫ ভাগ। এশিয়ার মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কার্বন নির্গমন সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম কার্বন নির্গমন হয় দক্ষিণ এশিয়ায়। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আবার বাংলাদেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা সবচেয়ে কম। কিন্তু রাজধানী ঢাকার চিত্র সম্পূর্ন ভিন্ন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে ম্যানিলায় এক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় জানানো হয়, বায়ুদূষণের দিক দিয়ে ঢাকা মহানগরী এশিয়া মহাদেশের মধ্যে শীর্ষে। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে পরিচালিত একটি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত ওই কর্মশালায় উত্থাপিত 'এয়ার কোয়ালিটি সার্ভে রিপোর্ট'-এ ঢাকাকে এশিয়ার সর্বাধিক বায়ু দূষণকবলিত নগরী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঢাকার এ বায়ুদূষণের প্রধান কারণ নিম্নমানের যানবাহনের আধিক্য। এ ছাড়া মহানগরীর চারপাশে থাকা কয়েক হাজার ইটভাটাও এ বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ।

'ঢাকা সিটি স্টেট অব এনভায়রনমেন্ট রিপোর্ট-২০০৩'-এর খসড়ায় নগরীকে ঘিরে রাখা চার হাজার ইটভাটার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গাবতলী, সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা প্রায় চার হাজার ইটভাটায় প্রতি বছর অত্যধিক সালফারযুক্ত নিম্নমানের কয়লা পোড়ানো হয় প্রায় ২০ লাখ টন। এ ছাড়া কাঠ পোড়ানো হয় আরো প্রায় ২০ লাখ মণ। শুধু তা-ই নয়, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কয়লার সঙ্গে পোড়ানো হয় টায়ার ও রাবার। ইটভাটায় ইট পোড়ানোর সময় কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ফ্লোরিন, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইটভাটার চিমনিতে কোনো ফিল্টার না থাকায় এসব বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। তা ছাড়া চিমনির উচ্চতা ১৫০ ফুট হওয়ার কথা থাকলেও বেশিরভাগ চিমনির উচ্চতা ৫০ থেকে ৮০ ফুটের মধ্যে।

ঢাকার বাতাসে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ বিষাক্ত সিসা, ধূলিকণা ও সালফারের উপস্থিতি নগরীর জনস্বাস্থ্যের প্রতি রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঢাকায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ছিল এক লাখ ৩৯ হাজার ৬৭৫। বছর দুয়েকের মধ্যে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১ লাখ ৭৫ হাজারের মতো। তখন প্রতিদিন ঢাকায় চলাচলরত এই পৌণে দুই লাখ মোটরযানের বিষাক্ত ধোঁয়ার সঙ্গে প্রায় ১০০ কেজি সিসার সূক্ষ্মকণা নির্গত হচ্ছিল। ওই সময়ই সিসার বিষে বিশ্বের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পাঁচটি শীর্ষ শহরের মধ্যে ঢাকা

ছিল দ্বিতীয়, প্রথম ছিল জাকার্তা।

বাতাসে ভাসমান সিসার আকার যখন দশমিক ৯ মাইক্রোমিটারের কম থাকে তখন ৫০ শতাংশ এবং যখন দশমিক ১ মাইক্রোমিটারের কম থাকে তখন ৯০ শতাংশ সিসা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সহজেই ফুসফুসে প্রবেশ করে। কাজেই সিসার বিষ থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরিতে এবং পরমাণু শক্তি কমিশনে স্নায়ুর সমস্যায় আক্রান্ত এক শিশুর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাতে সিসার পরিমাণ ১০০ মাইক্রোগ্রাম/ ডেসিলিটার, যা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ১০ গুণ বেশি। পরে আরো অনেক শিশু-রোগীর রক্তেও সিসার পরিমাণ বেশি পাওয়া গেছে। রাজধানীতে ক্রমেই শিশুরা অধিকহারে সিসার বিষে আক্রান্ত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের তখনকার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ মোহাম্মদ উল্লাহর তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সাল থেকে ঢাকার বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে গবেষণা করেন গবেষক শারমিন জাহান। তিনি টিজি (টক্সিক গ্যাস) মনিটরের সাহায্যে ঢাকার বিভিন্ন স্থানের বাতাসে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি রেকর্ড করেন। ঢাকার আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার বাতাস পরীক্ষা করে তিনি দেখেছেন, দিন দিন বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। মৌচাক, সায়েদাবাদ, তেজগাঁও, তোপখানা রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও ফার্মগেট এলাকার বাতাস তুলনামূলক বেশি দূষিত। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শিল্প এলাকার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের বার্ষিক গড় সহনীয় মাত্রা প্রতি কিউবিক মিটারে ৮০ মাইক্রোগ্রাম, আবাসিক এলাকায় ৬০ মাইক্রোগ্রাম এবং স্পর্শকাতর এলাকায় (হাসপাতাল, স্কুল) ১৫ মাইক্রোগ্রাম। কিন্তু ঢাকার সব এলাকায় এর চেয়ে অনেক বেশি দেখা গেছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সালে ঢাকার প্রতি ঘনমিটার বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইড ছিল গড়ে ৩৩৯ দশমিক ২৩ মাইক্রোগ্রাম। ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২৮ দশমিক ১৩ মাইক্রোগ্রামে। ২০১০ সালে বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৫৩৮ দশমিক ২০ মাইক্রোগ্রাম এবং ২০১১ সালের গড় ৬২৮ দশমিক ১২ মাইক্রোগ্রামে দাঁড়িয়েছে। নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের সহনীয় মাত্রাও সালফার ডাই-অক্সাইডের মতোই। বাতাসে এর পরিমাণও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সালে ঢাকায় প্রতি ঘনমিটার বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২১৯ দশমিক ৩৫ মাইক্রোগ্রাম। ২০০৯ সালে তা বেড়ে হয় ২৭১ দশমিক ১২ মাইক্রোগ্রাম। ২০১০ সালে ২৯৭ দশমিক ০১ এবং ২০১১ সালে তা বেড়ে ৩১২ দশমিক ৫০ মাইক্রো-গ্রাম হয়। একইভাবে বাড়ছে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণও। শিল্প এলাকায়

কার্বন মনোক্সাইডের প্রতি আট ঘণ্টার সহনীয় মাত্রা গড়ে ৫০০০ মাইক্রোগ্রাম, আবাসিক এলাকার ২০০০ এবং স্পর্শকাতর এলাকার জন্য ১০০০ মাইক্রোগ্রাম। কিন্তু ২০০৮ সালে ঢাকার বাতাসে গড় মাত্রা ছিল ৫১২৪ দশমিক ৩০ মাইক্রোগ্রাম, ২০০৯ সালে ৫১১৬ দশমিক ২০ মাইক্রোগ্রাম, ২০১০ সালে ৫৯৪৬ দশমিক ২১ মাইক্রোগ্রাম। ২০১১ সালে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬১২০ দশমিক ১৩ মাইক্রোগ্রামে। অধ্যাপক ড. শাহ্ মোহাম্মদ উল্লাহর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূপৃষ্ঠের ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার উপরে স্ট্রেটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু ট্রফোস্ফিয়ারে (ভূপৃষ্ঠের শূন্য থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে) ওজোনের উপস্থিতি মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অথচ ঢাকার বাতাসেও মাত্রাতিরিক্ত ওজোন গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ওজোনের সহনীয় মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৭৫ মাইক্রোগ্রাম। চার বছরের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৮ সালে ওজোনের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে কম ছিল। ওই বছর প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ৭১ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম থাকলেও ২০১১ সালে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ওজোন পাওয়া যায় গড়ে ১২০ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম। এ ছাড়া ২০০৯ সালে ১০৫ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম এবং ২০১০ সালে ১২০ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম ওজোন ছিল প্রতি ঘনমিটার বাতাসে।

ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকার বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণও গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণ বাণিজ্যিক এলাকার বাতাসে ধূলিকণার গ্রহণযোগ্য মাত্রা যেখানে ৪০০ মাইক্রোগ্রাম সেখানে ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকার বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ হচ্ছে ৬৬৫ থেকে ২ হাজার ৪৫৬ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এবং ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত নমুনা জরিপ থেকে দেখা যায়, ঢাকার বাতাসে Suspended particulate matter (এসপিএম) বা ভাসমান বস্তুকণার মান প্রায় সবকটি পয়েন্টে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি ছিল। এলাকাভেদে কয়েকটি পয়েন্টে এসপিএম চার-পাঁচগুণ বেশি। প্রতি ঘনমিটার বাতাসে এসপিএম-এর স্বাভাবিক পরিমাণ শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকার জন্য যথাক্রমে ৫০০, ৪০০ ও ২০০ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ফার্মগেট পুলিশ বক্স পয়েন্টে এসপিএম-এর সর্বোচ্চ মান (২ হাজার ৪৫৭ দশমিক ৬০৬ মাইক্রোগ্রাম) পাওয়া যায়। একই পয়েন্টে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি এবং মার্চে এসপিএম-এর মান পাওয়া যায় যথাক্রমে ১ হাজার ৪৯০ দশমিক ৩৩ এবং ১ হাজার ৭৩ দশমিক ৭৫ মাইক্রোগ্রাম। গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে এটি প্রায় ১৯ গুণ বেশি।

১৯৯৬ সালের অক্টোবরে মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে প্রতি

ঘনমিটার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের মান সর্বোচ্চ ২৩২ দশমিক ৩৬ মাইক্রোগ্রাম এবং সর্বনিম্ন ১৭৬ দশমিক ৫৩ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া যায়। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে তেজগাঁও (বাংলাদেশ বেভারেজ) পয়েন্টে ১৩৩ দশমিক ৮৪ মাইক্রোগ্রাম এবং ১৯৯৭ সালের মার্চে ফার্মগেট পুলিশ বক্স পয়েন্টে ১২৫ দশমিক ১২ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া যায়। অথচ সালফার ডাই-অক্সাইডের গ্রহণযোগ্য মান হচ্ছে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার জন্য যথাক্রমে ৮০, ১০০ ও ১২০ মাইক্রোগ্রাম। ওই সময় ঢাকা শহরে চলাচলকারী মোটরযান বা অটোমোবাইলের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার। ২০০৬ সালের আগস্ট নাগাদ ঢাকায় নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৫৭৭। মোটরযানের এই সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণও। পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের (একিউএমপি) অওতায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত সার্বক্ষণিক বায়ু পরিবীক্ষণ স্টেশনের (সিএমএস) মাধ্যমে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ওই এলাকার বায়ুমানসূচক (একিউআই ভ্যালু) পাওয়া যায় ২৩৫। বায়ুমান সূচকের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এ মান 'অস্বাস্থ্যকর'।

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট তিন চাকার যানবাহন বন্ধ করে দেওয়ার পর বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা কিছুটা কমে এসেছিল। কিন্তু ভাসমান বস্তুকণার উপস্থিতি কমেনি। পরিবেশ অধিদপ্তরের একিউএমপির অওতায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপন করা সার্বক্ষণিক বায়ু পরিবীক্ষণ স্টেশনের (সিএমএস) মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ওই এলাকার প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ ছিল ৩৭৫ মাইক্রোগ্রাম। ফেব্রুয়ারি মাসেও একই চিত্র লক্ষ করা যায়। অথচ এটি সংবেদনশীল এলাকা হওয়ায় এখানে ভাসমান বস্তুকণা থাকার কথা প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ১০০ মাইক্রোগ্রাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই ঢাকার বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত উপাদানের মাত্রাও বেড়ে যায় নিম্নমানের যানবাহনের আধিক্যের কারণে।

জীব প্রতিক্রিয়া : শ্বাস নেওয়ার ফলে বায়ু দূষণকারী পদার্থ শ্বাসনালীর উপরিতলে জমা হয়। জমা অদ্রাব্য পদার্থগুলো পরে কণ্ঠনালীর দিকে চলে যায়, সেখানে গলাধঃকরণ হয়। দেহের তরলে দ্রবীভূত এসব শ্বাস নেওয়া পদার্থ শ্বাসনালী থেকে রক্তপ্রবাহে চলে যায় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বায়ুদূষণকণা ফুসফুসের বাইরের অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। বিপাকীয় এনজাইম দ্বারা দূষণকারী পদার্থ রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়। যকৃত এ ব্যাপারে খুব সক্রিয়, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গেরও এ ক্ষমতা আছে। সাধারণভাবে বিপাক দেহ

যায়, ঢাকার বাতাসে Suspended particulate matter (এসপিএম) বা ভাসমান বস্তুকণার মান প্রায় সবকটি পয়েন্টে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি ছিল। এলাকাভেদে কয়েকটি পয়েন্টে এসপিএম চার-পাঁচগুণ বেশি। প্রতি ঘনমিটার বাতাসে এসপিএম-এর স্বাভাবিক পরিমাণ শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকার জন্য যথাক্রমে ৫০০, ৪০০ ও ২০০ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ফার্মগেট পুলিশ বক্স পয়েন্টে এসপিএম-এর সর্বোচ্চ মান (২ হাজার ৪৫৭ দশমিক ৬০৬ মাইক্রোগ্রাম) পাওয়া যায়। একই পয়েন্টে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি এবং মার্চে এসপিএম-এর মান পাওয়া যায় যথাক্রমে ১ হাজার ৪৯০ দশমিক ৩৩ এবং ১ হাজার ৭৩ দশমিক ৭৫ মাইক্রোগ্রাম। গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে এটি প্রায় ১৯ গুণ বেশি।

১৯৯৬ সালের অক্টোবরে মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের মান সর্বোচ্চ ২৩২ দশমিক ৩৬ মাইক্রোগ্রাম এবং সর্বনিম্ন ১৭৬ দশমিক ৫৩ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া যায়। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে তেজগাঁও (বাংলাদেশ বেভারেজ) পয়েন্টে ১৩৩ দশমিক ৮৪ মাইক্রোগ্রাম এবং ১৯৯৭ সালের মার্চে ফার্মগেট পুলিশ বক্স পয়েন্টে ১২৫ দশমিক ১২ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া যায়। অথচ সালফার ডাই-অক্সাইডের গ্রহণযোগ্য মান হচ্ছে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার জন্য যথাক্রমে ৮০, ১০০ ও ১২০ মাইক্রোগ্রাম। ওই সময় ঢাকা শহরে চলাচলকারী মোটরযান বা অটোমোবাইলের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার। ২০০৬ সালের আগস্ট নাগাদ ঢাকায় নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৫৭৭। মোটরযানের এই সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণও। পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের (একিউএমপি) অওতায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত সার্বক্ষণিক বায়ু পরিবীক্ষণ স্টেশনের (সিএমএস) মাধ্যমে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ওই এলাকার বায়ুমানসূচক (একিউআই ভ্যালু) পাওয়া যায় ২৩৫। বায়ুমান সূচকের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এ মান 'অস্বাস্থ্যকর'।

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট তিন চাকার যানবাহন বন্ধ করে দেওয়ার পর বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা কিছুটা কমে এসেছিল। কিন্তু ভাসমান বস্তুকণার উপস্থিতি কমেনি। পরিবেশ অধিদপ্তরের একিউএমপির অওতায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপন করা সার্বক্ষণিক বায়ু পরিবীক্ষণ স্টেশনের (সিএমএস) মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ওই এলাকার প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ ছিল ৩৭৫ মাইক্রোগ্রাম। ফেব্রুয়ারি মাসেও একই চিত্র লক্ষ করা যায়। অথচ এটি সংবেদনশীল এলাকা হওয়ায় এখানে ভাসমান বস্তুকণা থাকার কথা প্রতি

ঘনমিটার বাতাসে ১০০ মাইক্রোগ্রাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই ঢাকার বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত উপাদানের মাত্রাও বেড়ে যায় নিম্নমানের যানবাহনের আধিক্যের কারণে।

জীব প্রতিক্রিয়া : শ্বাস নেওয়ার ফলে বায়ু দূষণকারী পদার্থ শ্বাসনালীর উপরিতলে জমা হয়। জমা অদ্রাব্য পদার্থগুলো পরে কণ্ঠনালীর দিকে চলে যায়, সেখানে গলাধঃকরণ হয়। দেহের তরলে দ্রবীভূত এসব শ্বাস নেওয়া পদার্থ শ্বাসনালী থেকে রক্তপ্রবাহে চলে যায় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বায়ুদূষণকণা ফুসফুসের বাইরের অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। বিপাকীয় এনজাইম দ্বারা দূষণকারী পদার্থ রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়। যকৃত এ ব্যাপারে খুব সক্রিয়, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গেরও এ ক্ষমতা আছে। সাধারণভাবে বিপাক দেহ থেকে দূষণকণাকে বের করে দিতে সাহায্য করে এবং এভাবে দেহের টিস্যুর দূষণ মাত্রা কমিয়ে দেয়। বিপাক বর্ধিত বিষাক্ত উপাদানও তৈরি করে। শ্বাসের সঙ্গে যে দূষণকণা ঢুকে তার কতকগুলো প্রত্যক্ষভাবে সাড়া জাগায়, যেমন—হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট; কতকগুলোর প্রভাব পরবর্তী সময়ে পরোক্ষভাবে দেখা দেয় এবং টিস্যুগুলোকে নষ্ট করে ফেলে, যেমন—ফুসফুসের অংশবৃদ্ধি ও ফুলে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব : কিছু দূষণকারী পদার্থ বায়ুতে খুব কম পরিমাণে থাকলেও এরা খুবই বিপজ্জনক; যেমন হাইড্রোক্সিল রেডিক্যালের মাত্রা $১০^{-৬}$ থেকে $১০^{-৭}$ পিপিএম, কিন্তু এটি বায়ুতে রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে খুবই সক্রিয়। বায়ুমণ্ডলের নির্গত গ্যাসের সঙ্গে বেশিরভাগ বিক্রিয়ায় এটি অংশগ্রহণ করে। স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক অথচ বাতাসে দিন দিন পরিমাণ বাড়ছে এরকম কিছু দূষণকারী পদার্থ সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হল :

ক) কার্বন মনোক্সাইড (CO) : সাধারণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যে-অক্সিজেন গ্রহণ করি তা রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সি-হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। রক্ত-প্রবাহের সাহায্যে এই অক্সিজেন সারা দেহের টিস্যুগুলোতে সঞ্চালিত হয়। কার্বন মনোক্সাইড এই অক্সিজেনকে সরিয়ে দেয়। হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা অক্সিজেনের তুলনায় কার্বন মনোক্সাইডের ২৫০ গুণ বেশি। রক্তের সঙ্গে মিশে তা কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। হিমোগ্লোবিনে কার্বন মনোক্সাইড যুক্ত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ টিস্যুগুলোতে আর অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না। কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্গে রক্তের বিক্রিয়া উভয়মুখী, এটা রক্তে জমা থাকে না। যখন বায়ুমণ্ডলে কোনো কার্বন মনোক্সাইড থাকে না তখন নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন মনোক্সাইড বেরিয়ে আসে। বায়ুমণ্ডলে ১০০ পিপিএম কার্বন মনোক্সাইড

থাকলে তা শ্বাসের সঙ্গে রক্তে গিয়ে ১০ শতাংশ কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। এই মাত্রায় মাথা ব্যথা হয় এবং মাথা ঝিমঝিম করে। ৫০ শতাংশ কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। শহরাঞ্চলে মানুষের কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলা ও অস্বস্তিবোধ কার্বন মনোক্সাইডের জন্যই বেশি হয়ে থাকে। আরেকটি বিপদ হলো, কার্বন মনোক্সাইড অন্যান্য দূষণকণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-পদার্থ তৈরি করে তা ফুসফুস ও রক্তপ্রবাহসংক্রান্ত রোগ বাড়িয়ে দেয়। ঢাকার বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের সঠিক মাত্রা জানা না গেলেও তা যে কয়েকগুণ বেশি হবে সেটি আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। কেননা নয়াদিল্লির মতো শহরেই এর মাত্রা তিনগুণেরও বেশি।

খ) হাইড্রোকার্বন : গাসলিনের বাষ্পীভবন ও দহন ঠিকমতো না হওয়ার ফলে বেশ কিছু হাইড্রোকার্বন বেরিয়ে আসে যানবাহন থেকে। এদের উদ্বায়ীতা ও সক্রিয়তা বিপজ্জনক করে তোলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে। বেনজিন ও তার সমানু, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন–এগুলো ব্যাকটেরিয়া, কোষ বা জীবের ক্ষতি করে। নাইট্রোজেন অক্সাইডের সঙ্গে অলিফিন বিক্রিয়া করে ওজোন ও ফটোরাসায়নিক ধোঁয়া তৈরি করে। এসব পদার্থ চোখে যন্ত্রণা দেয় এবং হাঁচি, কাশি সৃষ্টি করে; তন্দ্রাভাব ঘটায়; মনে হয় নেশাগ্রস্ত। হাইড্রোকার্বন থেকে অথবা হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড, অ্যাক্রোলিন, পারক্সি অ্যাসাইল ও বেনজাইল নাইট্রেট তৈরি হয়; এসব পদার্থ গলা ও চোখের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। এসব হাইড্রোকার্বন কোষের পরিবর্তন ঘটায়, যা ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়ক।

ফটো রাসায়নিক কাজ : নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) সাধারণত শ্বাসনালীর ক্ষতি করে। এ উপাদানটি ফুসফুসের ভেতর নাইট্রোসোমাইন-এ পরিবর্তিত হয়, যা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড রক্তে মিথোগ্লোবিনে রূপান্তর ঘটে, এটি দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা দেয়। নাইট্রোজেন অক্সাইড ঘনত্বের মাত্রা সর্বোচ্চ এক পিপিএম হতে পারে। নাইট্রোজেন মনোক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড (NO) সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির সাহায্যে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন পরমাণু তৈরি করে। পরে এই অক্সিজেন পরমাণু বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরি করে ওজোন (O_3)। জলীয় বাষ্পের হাইড্রোক্সিল রেডিক্যাল, অক্সিজেন ও নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে বায়ুতে প্রাপ্ত উদ্বায়ী জৈবযৌগ (VOC) বিক্রিয়া করে পারক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। পারক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট ফটো রাসায়নিক ধোঁয়ার একটি উপাদান। VOC অন্য আরেকটি পথে নাইট্রোজেন মনোক্সাইডকে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড-এ পরিণত করে। সূর্যরশ্মির উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন অক্সাইড

সক্রিয় হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওজোন, অন্যান্য জারক পদার্থ ও ফটোরাসায়নিক ধোঁয়া তৈরি করে। ওজোন ফুসফুসের বায়ুবাহী পথগুলোকে সরু করে দেয়, কিছু প্রোটিনের জারনের কারণে ফুসফুসের আয়ু কমিয়ে দেয়। ওজোন ও ফটো রাসায়নিক ধোঁয়া চোখ, নাক ও গলায় যন্ত্রণা সৃষ্টি করে; ফুসফুসের কাজকে পরিবর্তন করে; মানুষের কায়িক কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়; হাঁপানি ও মাথার যন্ত্রণা বাড়ায়; কাশি ও বুকে সংক্রামক রোগ তৈরি করে; রক্তের বিভিন্ন মাত্রাকে পরিবর্তিত করে দেয়।

এসব তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বায়ুদূষিত এলাকায় বসবাস করে প্রতিমুহূর্তে আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষই গ্রহণ করছি। ঢাকা শিশু হাসপাতালের এক সমীক্ষায় বলা হয়, দেশের প্রায় এক কোটি লোক শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগে ভুগছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বায়ুদূষণের শিকার। বায়ুদূষণের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা। এ দূষণের কারণে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্মের হার বাড়ছে। আর বয়স্কদের মধ্যে বাড়ছে ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিউলাস, নিউমোনিয়া, হৃদরোগ, ফুসফুসের অকার্যকারিতা, চোখের প্রদাহসহ নানা ধরনের রোগ।

বজ্রে দূষণ, দূষণে বজ্র

এখন থেকে ১৫-২০ বছর আগেও বজ্রপাত মানুষের কাছে তেমন আতঙ্কের বিষয় ছিল না। আমাদের দেশে কয়েক থানা এলাকা ঘুরে হয়তোবা দু-একটি নারিকেল বা তালগাছের দেখা পাওয়া যেত, বজ্রপাতে যেগুলোর উপরের অংশ পুড়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং ঝড়ের মৌসুমে বাজ পড়ে মানুষের প্রাণহানিটা যেন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, দেশে বজ্রপাত এবং এর দরুন প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা দিন দিনই বাড়ছে। কিন্তু এ নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে লক্ষ করা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণহানির সংবাদ সংগ্রহ করার মাধ্যমেই তাদের দায়িত্ব সারছে। বজ্রপাত বাড়ার কারণ জানা বা প্রতিরোধের উপায় বের করার বিষয়ে কোনো গবেষণাও নেই কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের। এমনকি বজ্রপাতে প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায় নিয়ে চিন্তাও ছিল না এতদিন।

২০০৮ সাল থেকে পর পর কয়েক বছর বজ্রপাত নিয়ে লিখেছি একাধিক জাতীয় দৈনিকে। প্রতিবারই লেখার আগে কথা বলেছি আবহাওয়া অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (বর্তমানে অধিদপ্তর), বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের (এসএমআরসি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে। সবাই এক সুরে বলেছেন, বজ্রপাত নিয়ে কোনো গবেষণা নেই তাদের। এমনকি বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মানতেও রাজি হননি তখনকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কর্মকর্তারা। ব্যুরোর তখনকার কমিউনিকেশনস ও মিডিয়া স্পেশালিস্ট সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছিলেন, বজ্রপাত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। এটি দুর্যোগের সাইড ইফেক্ট (পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া) মাত্র। এমন অবস্থায় ২০১২ সালে একটি লেখার শিরোনামই দিয়েছিলাম 'আর কত প্রাণ গেলে তারে দুর্যোগ বলা যায়'।

বাংলাদেশে বজ্রপাত নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা না থাকলেও উন্নত বিশ্বে এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বিস্তর। এসব গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বায়ুদূষণের সঙ্গে বজ্রপাতের নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। গবেষকরা লক্ষ করেছেন, বজ্রপাত একদিকে যেমন বাতাসে দূষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে, তেমনি আবার বায়ুদূষণের ফলে বাড়ছে বজ্রপাতের হার ও তীব্রতা। এ যেন দূষণের এক নতুন দুষ্টচক্র। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অ্যাঅ্যান্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী নাসার কারিগরি সহায়তায় উপগ্রহের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন,

বজ্রপাতের পরপরই ট্রপসফিয়ারে (বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর) প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড (নাইট্রিক অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড) তৈরি হয়। কার্বনডাই-অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইডের চেয়েও বিষাক্ত এ নাইট্রোজেন অক্সাইড রূপান্তরিত হয়ে যায় ওজোন গ্যাসে। সেই গ্যাস বাতাসের এমন একটি স্তরে জমে থাকছে যে, এর ফলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ওই বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাপত্রে বলেছেন, বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট দূষিত অক্সাইড পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। যানবাহনের কারণে দূষণ বা শিল্পদূষণের চেয়ে বজ্রপাতজনিত দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। ওই গবেষক দলের প্রধান ড. রেনি ঝাংয়ের মতে, বজ্রপাত যেমন বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে, তেমনি আবার দূষণের ফলে বাড়ছে বজ্রপাতের হার। তবে কেন এমন হচ্ছে তা জানতে আরো গবেষণা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

একই বিষয়ে গবেষণা করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী এনএম টমসন ও তার সঙ্গীরা। বেলুন উড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারা। ঘন ঘন বৃষ্টিতেও মেক্সিকো সিটির বায়ুদূষণ কেন কমছে না তা পরীক্ষা করে টমসন বলেছেন, 'বৃষ্টির পানি বায়ুমণ্ডলের দূষিত পদার্থকে ধুয়ে দিচ্ছে ঠিকই; কিন্তু প্রতিবার বাজ পড়ার পরই বাতাসে দূষণ বহুগুণ বেড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। কারণ মেঘের ঘর্ষণে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরি হচ্ছে। সেটা ওজোনে রূপান্তরিত হয়েই সমস্যার সৃষ্টি করছে।'

নাসার মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে বজ্রপাত নিয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম কোশাক। তিনিও বলেছেন, 'বজ্রপাত হচ্ছে ট্রপসফিয়ারের উপরিস্তরে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর এ অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ওজোন ও হাইড্রক্সিলের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখায় আমাদের জলবায়ুকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করে।'

বজ্রপাতের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ বাড়ার সম্পর্কের বিষয়টি ধরা পড়ে নাসার সাহায্যপুষ্ট আরো কয়েকটি গবেষণায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমোসফেরিক রিসার্চের (এনসিএআর) বিজ্ঞানী ডেভিড এডওয়ার্ডস ও তার সঙ্গীরা কানাডা এবং ইউরোপের কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে দেখতে পেয়েছেন, বায়ুস্তরের কাছাকাছি যেখানেই ওজোনের পরিমাণ বেশি, সেখানেই বজ্রপাত হয়েছে বেশি মাত্রায়। নাসার বিশেষ মহাকাশযানে চেপে ওই সমীক্ষা চালানোর পর এডওয়ার্ডস তার গবেষণাপত্রে বলেছেন, 'দাবানলে যে পরিমাণ ওজোন তৈরি হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি তৈরি হয় বজ পাতে। বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে ওজোনের পরিমাণ বাড়ার জন্য মূলত বজ্রপাতই দায়ী।' বজ্রপাত ও বায়ুদূষণের এ দুষ্টচক্র কীভাবে ভাঙা যায় সেটাও অবশ্য খতিয়ে দেখছে নাসা।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক টমাস ডাব্লিউ স্মিডলিন তার এক

গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, ঝড়, বজ পাত ও শিলাবৃষ্টিতে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে বাংলাদেশে। বজ্রাঘাতে বছরে দেড় শর মতো লোকের প্রাণহানির খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হলেও স্মিডলিনের মতে, প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজার। এ দেশে বজ্রপাত বেশি হয় মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সময়ে। ওই সময় প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাজ পড়ে ৪০টি। ২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে একটি বাড়িতে বজ্রাঘাতে ৯ জন নিহত এবং ২৩ জন আহত হওয়ার তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে স্মিডলিনের গবেষণাপত্রে।

২০১২ সালে শুধু এপ্রিল মাসেই দেশে ১০০ লোক মারা গেছে বজ্রাঘাতে। সে বছরের ১১ মে বার্তা সংস্থা ইউএনবি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। মে মাসের শুরু থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত দেশে ২৯ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে ইউএনবি। সে বছরের ১০ আগস্ট রাতে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার এক প্রত্যন্ত গ্রামে টিনশেডের অস্থায়ী মসজিদে নামাজ পড়ার সময় বজ্রাঘাতে ইমামসহ ১৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় ওই বছর ২৪ মে রাতে বজ্রাঘাতে তিন দিনমজুর নিহত এবং এক গৃহবধূ আহত হন। ওই সময় মালপত্রসহ দুটি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে সে বছরের ২৬ মে কালের কণ্ঠ জানায়, রাত ৮টার দিকে সরিষাবাড়ী উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নের ছাতারিয়া পূর্বপাড়া, ভাটারা ইউনিয়নের চৌখা ও মহাদান ইউনিয়নের কড়গ্রামে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রের আঘাতে ছাতারিয়া পূর্বপাড়া গ্রামের আবদুল হামিদের বাড়ির দিনমজুর নবীন, মোহাম্মদ ও ময়নাল নিহত হন। ওই সময় তাঁরা ধানক্ষেতের পাশের ঘরে ছিলেন। বজ্রপাতে ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে বছর ৮ এপ্রিল এক দিনেই বজ্রাঘাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাতজনের মৃত্যু হয়। ওই খবর প্রকাশিত হয়েছে পরদিন ৯ এপ্রিল কালের কণ্ঠে। ওই দিন আহত হয় আরো ৯ জন। পত্রিকার ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারিতে দুজন এবং বিয়ানীবাজার উপজেলার উলুউরি নয়াপাড়া গ্রামে একজনের মৃত্যু হয়। এ দুই ঘটনায় আহত হয়েছে ৯ জন। এ ছাড়া চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নারায়ণহাট ইউনিয়নের চানপুর গ্রামে একজন বজ্রাঘাতে মারা গেছে। অন্যদিকে দিনাজপুর, বাগেরহাট ও কুমিল্লায় ওই দিন বজ্রাঘাতে তিনজন নিহত হয়েছে।

২০১১ সালের ২৩ মে বজ্রপাতে বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ৩৫ জনের মৃত্যু ঘটে। আহত হয় অর্ধশতাধিক লোক। প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ ও বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের খবর অনুযায়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, নাটোর, নোয়াখালী, পাবনা, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, চাঁদপুর, মাগুরা, টাঙ্গাইল, নওগাঁ, খুলনা, কুমিল্লা, ভোলা, গোপালগঞ্জ ও খাগড়াছড়ি জেলায়

এসব প্রাণহানি ঘটে। শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়ই মারা যায় ৯ জন। চারজন মারা যায় রাজশাহীতে। এর আগের দিন ভোলায় বজ্রাঘাতে মারা যান দুই কৃষক। 'সাতজন মারা গেল বজ্রাঘাতে' শিরোনামে ২৩ মে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, মেহেরপুর, নেত্রকোনা, নরসিংদী, চাঁদপুর ও রূপগঞ্জে (নারায়নগঞ্জ) বজ্রাঘাতে স্কুলছাত্রী, গৃহবধূসহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। 'বজ্রাঘাতে জামালপুরে বাবা-মেয়ে, জয়পুরহাটে কৃষকের মৃত্যু' শিরোনামে একই পত্রিকায় ২০১১ সালের ২২ মে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বগারচর নামাপাড়া গ্রামে ২১ মে সকালে বজ্রপাতে বাবা ও মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন বাবা হাসমত আলী (৫৫) ও মেয়ে ফুলেছা (২০)। ওই সময় হাসমত আলীর অন্য মেয়ে রমেছা (১৮) গুরুতর আহত হন। টিনের ঘরের চালের ওপর বাজ পড়ায় ঘরের ভেতর থাকা হাসমত আলী ও ফুলেছা মারা যান। একই দিনে জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার উত্তর মহেশপুর গ্রামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। উত্তর মহেশপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে কৃষক নুর মোহাম্মদ স্থানীয় শালুকডুবি বিলে ধান দেখতে নিজের জমিতে গেলে সকাল সাড়ে ৭টায় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত অপর এক খবরে জানা যায়, ২০১১ সালের ১৬ মে কিশোরগঞ্জে একই সময়ে ছয় ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বজ্রপাত। আহত হয়েছে আরো অন্তত চারজন। ওইদিন সকালে কিশোরগঞ্জের নিকলী ও বাজিতপুর উপজেলার হাওরে দুটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার ব্যক্তিরা হলেন নিকলীর পাড়া বাজিতপুর গ্রামের শুকলাল দাস (২৮), পূর্বগ্রাম বাজারহাটির মানিক মিয়া (৩৮), শামসু মিয়া (৫০) ও রাসেল মিয়া (১৬) এবং বাজিতপুরের হিলচিয়া নোয়াগাঁওয়ের ইসহাক মিয়া (৬০) ও ইব্রাহিম মিয়া (৬০)। গুরুতর আহত নোয়াগাঁওয়ের কফিলউদ্দিন, ফজর আলী, কালাচান মিয়া ও নিকলীর পূর্বগ্রামের জামান মিয়াকে জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ডেইলি স্টার-এ প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ২০০৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার কমলাবাড়ী গ্রামে বজ্রপাতে এক পরিবারের পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটে। এর আগে ৩ জুন ভোলায় মারা যায় তিনজন। একই বছর ৯ অক্টোবর চট্টগ্রামে বাজ পড়ে এক তরুণ ও এক শিশু মারা যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলায় একজনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ২২ আগস্ট ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় একজন, ২৯ মে মাগুরার শালিখা উপজেলায় এক গৃহবধূ এবং ৩১ মার্চ ঢাকার কেরানীগঞ্জে এক প্রবাসীসহ দুজন মারা যায় বজ্রপাতে।

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার মতিননগরে ২০০৮ সালের ৩ জুন বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে কাঁচাঘরে অবস্থানরত একটি পরিবারের চারজন সদস্য মারা যান। এ ঘটনায় ওই পরিবারের আরো চার সদস্য আহত হন। পরদিন ৪ জুন রাতে নীলফামারী সদর ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে মারা যান পাঁচজন। আরো পাঁচজন হন আহত। একই রাতে বাগেরহাট ও জামালপুরে মারা যান আরো দুজন। এর আগে ১৮ মে রাতে ফেনী শহরতলির পশ্চিম বিজয়সিং গ্রামে বজ্রপাতে একটি ঘরে এক মহিলা নিহত এবং শিশুসহ তিনজন আহত হন। এছাড়া বজ পাতে সৃষ্ট আগুনে গ্রামের সাতটি বসতঘরসহ ১৪টি ঘর পুড়ে যায়। এর কয়েকদিন পর ২৪ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, মেহেরপুর, নাটোর, পাবনা, বাগেরহাট, নড়াইল ও নেত্রকানা–এ আট জেলায় বজ্রপাতে ১৭ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হন। দেশে বজ পাতে একদিনে প্রাণহানির সংখ্যা এটি সর্বোচ্চ। বার্তা সংস্থা বাসস ও ইউএনবির খবরে জানা যায়, ওই বছর ২৭ মে বজ্রপাতে কুমিল্লায় এক পরিবারের দুজনের মৃত্যুসহ পাঁচ জেলায় ১১ জনের প্রাণহানি ঘটে। এদিনের ঘটনায় আহত হন আরো ছয়জন। বিভিন্ন বার্তা সংস্থা ও পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সে বছর ১৮ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১৮ দিনে দেশের নানা স্থানে বজ্রপাতে ৫১ জনের প্রাণহানি ঘটে। এর আগে ২০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ১৬ দিনে দেশে বজ্রপাতে ২১ জনের মৃত্যুর খবর জানা যায়। এ হিসাবে ৩৩ দিনে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫। দেশে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের ঘটনা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ চলে। ওই বছর ৪ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার একটি হাওরে বাজ পড়ে দুজন মারা যায়।

২০০৭ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আড়াই মাসে বজ্রপাতে দেশে ৩৫ জনের মৃত্যুর হিসাব পাওয়া যায়। ওই বছরের ১৫-১৬ জুলাই দুদিনে দেশে বজ্রপাতে ১৭ জনের প্রাণহানির খবর পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার ওয়েবসাইটেও প্রচারিত হয়েছিল। সে তুলনায়ও ২০০৮ সালে দেশে বজ পাতে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তির দিকে ছিল।

২০০৪ সালের ২২ জুন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নিউজে এক নিবন্ধে বজ্রপাতকে Second largest weather related killer (আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলেই গণ্য করতে রাজি নয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কমিউনিকেশনস ও মিডিয়া স্পেশালিস্ট সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বজ্রপাত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। এটি দুর্যোগের সাইড ইফেক্ট (পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া) মাত্র। তিনি জানান, বজ্রপাত নিয়ে কোনো গবেষণা ব্যুরোর নেই। তবে ব্যুরোর প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। বজ্রপাতে প্রাণহানির

খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা তারা সংগ্রহ করেন। কোথাও প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি বেশি হলে ব্যুরোর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট দেওয়া হয়। আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে যে ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষদের পক্ষে তেমনটি নেওয়া কঠিন।'

স্পারসোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, বজ্রপাত নিয়ে কোনো গবেষণা নেই তাদেরও। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ মো. শহীদুল ইসলাম জানান, বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়াই তাদের কাজ। এছাড়া বজ্রপাতে মৃত্যুর খবর পত্রিকায় বেরুলে সেটি তারা সংগ্রহ করেন। এর বাইরে এ নিয়ে কোনো গবেষণা বা কাজ অধিদপ্তরের নেই। সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের (এসএমআরসি) সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা আবুবকর আবদুল্লাহর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। পরে একজন বিজ্ঞানী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বজ্রপাতসংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের একটি প্রকল্প আছে এসএমআরসির। এর বেশি কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

বজ্রপাতে যারা মারা যায় তাদের প্রায় সবাই গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ। সে কারণেই হয়তোবা মাথাব্যথা নেই আমাদের দেশের গবেষকদের।

বিশ্বজুড়েই বজ্রপাতে প্রাণহানি বাড়ছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুরে ২০১০ সালের ১১ মে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় ১০ জনের। আহত হয় আরো ১০ জন। ওই দিনই স্টার আনন্দ নিউজ বুলেটিনে বলা হয়, আহতদের ভর্তি করা হয়েছে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৩ মহিলা ও ১ শিশু। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, ২০১০ সালের ৪ অক্টোবর ভারতের মহরাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর অঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় বজ্রাঘাতে ২৮ জনের প্রাণহানি ঘটে। আহত হয় আরো ২৭ জন। আনন্দবাজার পত্রিকা জানায়, ২০০৭ সালের মার্চ থেকে মধ্য আগস্ট পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বজ্রাঘাতে মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসেবেই ৮২। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, ২০০৬ সালের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাসে ভারতের কেবল উড়িষ্যাতেই ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে বজ্রাঘাতে। একই অবস্থা ইউরোপ-আমেরিকায়ও। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে ৭৫ থেকে ১০০ জনের মৃত্যু ঘটে বজ্রাঘাতে। ২০০৩ সালে সে দেশে বজ্রাঘাতে মারা যায় পাঁচ শর বেশি মানুষ। আমাদের দেশে সাধারণত গরিব মানুষ বজ্রপাতের শিকার হলেও ইউরোপ-আমেরিকায় নভোচারীরাও রেহাই পাচ্ছেন না এ প্রাকৃতিক ঘাতকের হাত থেকে। বজ্রপাতের হাত থেকে মহাকাশযান ও নভোচারীদের রক্ষা করতে তাই এক বিরাট প্রকল্প হাতে নিয়েছে নাসা।

পানির অপর নাম মরণ

মানুষের শরীরের শতকরা ৬৫ ভাগই পানি। ঘাম ও প্রস্রাবের মতো বিভিন্ন স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কিছু পানি প্রতিনিয়ত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। বিশুদ্ধ পানি পান করে এটা পূরণ করতে হয়। তা না হলে কী অবস্থা দাঁড়ায় সেটা সবারই জানা। আর কোনো কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে (dehydration) জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। এ কারণেই পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবন অচল। এমনিতে পানির তেমন অভাবও নেই পৃথিবীতে। ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ জুড়ে আছে পানি। কিন্তু তাতে কি। বিশুদ্ধ বা সুপেয় পানি তো মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। তাও আবার এর বেশিরভাগটাই গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে জমাট বাঁধা বরফ। এছাড়া আর যেটুকু বিশুদ্ধ পানি আছে তার বেশিরভাগই মাটির নিচে। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আছে শতকরা এক ভাগেরও কম। এটুকু পানিও আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘনবসতি অঞ্চলের মানুষের নাগালের বাইরে অর্থাৎ জনপদ থেকে অনেক দূরে। এ পানিও দিন দিন দূষণের কবলে পড়ে বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

প্রাচীনকাল থেকে মাটির ওপরের পানিই (surface water) ব্যবহার করে আসছিল মানুষ। এখন নদ-নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের পানি প্রাকৃতিক উপায়ে স্বয়ংশোধিত পদ্ধতিতে (Self Purification System) দূষণমুক্ত হতো। কিন্তু জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও শিল্পায়নের দরুন এ পদ্ধতি ক্রমেই অকার্যকর হতে থাকে। শুরু হয় গভীর কিংবা অগভীর নলকূপের সাহায্যে মাটির নিচের পানি (ground water) ব্যবহার। কিন্তু এর ফলে মাটির নিচের পানিস্তরও নিচে নামতে শুরু করে। এ অবস্থায় বর্তমানে বিশ্ব এক গভীর সঙ্কটের মুখে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মরুকরণের ফলে পানি সঙ্কট আরো তীব্র হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানির সঙ্কটের কারণে বিশ্বের ১০০ কোটির বেশি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা আজ ঝুঁকির মুখে। প্রতিবছর বিশ্বে ২৫ হাজারের বেশি লোক মারা যায় পানির অভাবে কিংবা দূষিত পানি পান করে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ২০০৯ সালের আগস্টে বিশ্ব পানি সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গিয়ে সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতাবিষয়ক মন্ত্রী গুনিলা কার্লসন বলেন, বিশ্বে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে পানি ও স্যানিটেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে। ওই সম্মেলনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাসহ প্রায় দুই হাজার বিশেষজ্ঞ

গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কলিন চারট্রেস বলেন, অব্যাহত পানিদূষণ পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক অসন্তোষ বাড়াবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে এশিয়ার পাশের দেশগুলোতে।

বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষের পানি সংকটের প্রেক্ষাপটেই ২০০৩ সালকে 'আন্তর্জাতিক মিঠাপানি বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছিল জাতিসংঘ। সে বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবশের মূল প্রতিপাদ্যও ছিল পানি। অন্যান্য দেশে যা-ই হোক না কেন নদীমাতৃক বাংলাদেশে তীব্র পানি সংকট দেখা দেবে এটা কি ভাবা যায়? কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০০৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসেই (৫ জুন) প্রথম আলোতে লাল রঙে শিরোনাম ছাপা হয় 'পানি সংকটে ৩ কোটি মানুষ'। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী দেশে এখন প্রায় ৩ কোটি মানুষ সাংবাৎসরিক পানি সঙ্কটে নিপতিত। শুকনো মৌসুমে এই সঙ্কট এখন প্রায় সারা দেশেই দেখা দেয়। বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সারা দেশে ছোট-বড় মিলে ২৪০টি নদীর মধ্যে ১০০টিরও বেশি নদীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে। করতোয়া ও বড়ালের মতো ঐতিহ্যবাহী নদীগুলোসহ অনেক শাখানদী স্থানবিশেষে ফসলের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। নদীদখল ও নদীর পানি দূষণও চলছে লাগামহীন মাত্রায়, বিশেষত শহরাঞ্চলে। এমনিতে প্রাকৃতিক কারণে নদীগর্ভে পলি জমে নদীর নাব্যতা কমে যায়, সেই সঙ্গে মানুষের দখলবাজি যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের নদ-নদী এখন সত্যিই বিপন্ন। দেশের নদীগুলোতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩ কোটি টন পলি-বালি জমে। এ জন্য প্রতি বছর ৫১৮ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং দরকার। কিন্তু প্রয়োজনের মাত্র ১৫ শতাংশ ড্রেজিং করা হয়। আর নদীর পানি দূষণের কথা বলাই বাহুল্য। একই পত্রিকায় ২০১০ সালের বিশ্ব পানি দিবসে (২২ মার্চ) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'ঢাকার নদীর পানি শোধনেরও অযোগ্য'।

একদিকে গেরস্থালির আবর্জনা, শিল্প ও কৃষি খামারের বর্জ্য, মানুষ ও পশুর মলমূত্র থেকে ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষিত হচ্ছে; অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠের পানির বিভিন্ন উৎসের দূষণ এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে অচিরেই মাটির নিচের পানিও দূষিত হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের গবেষণার বরাত দিয়ে ২০০৮ সালের ১৯ মে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম জানায়, ট্যানারি বর্জ্য থেকে নির্গত ক্রোমিয়ামের কারণে ঢাকার হাজারীবাগ ও এর আশপাশের এলাকার মাটি চার মিটার গভীর পর্যন্ত দূষিত হয়ে পড়েছে।

পানিদূষণ : পানির গুণাগুণের যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর পরিবর্তনই হলো পানিদূষণ। আগেই বলা হয়েছে, গেরস্থালির আবর্জনা, শিল্প ও কৃষি

খামারের বর্জ্য, মানুষ ও পশুর মলমূত্র থেকে ভূ-পৃষ্ঠের পানিদূষণ ঘটে। শিল্পে ব্যবহৃত এসিড, বালাইনাশক, তেল ও বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদকে ধ্বংস করে দেয়। রাসায়নিক সার, সাবানজাতীয় দ্রব্য ও বিষ্ঠা জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদকে মাত্রাতিরিক্ত পুষ্টি জোগানোর মাধ্যমে পানির দূষণ ঘটায়। বেশি পুষ্টির ফলে জলজ শেওলা অত্যধিক বাড়ে এবং পরবর্তী সময়ে মরে যায়। ব্যাকটেরিয়া এসব মৃত শেওলার পচন ঘটাতে অত্যধিক পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। এর ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। এ ধরনের দূষনকে ইউট্রোফিকেশন বলে।

বিশ্ব পানি কমিশনের বরাত দিয়ে ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর ইন্টার প্রেস সার্ভিস (আইপিএস) জানায়, বিশ্বের অর্ধেকের বেশি প্রধান নদ-নদী দূষিত ও রিক্ত হয়ে গেছে। এতে বিষাক্ত হয়ে উঠছে চারপাশের পরিবেশ। কয়েক কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশনের মতে, উন্নত ও অনুন্নত সব দেশেই নদ-নদীর অবস্থা খারাপ। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নদী হলো কলোরাডো। কমিশন ইউরেশিয়ার যেসব নদীর পানিকে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে অভিহিত করেছে সেগুলোর মধ্যে আছে গঙ্গা, ইউলো, আমুদারিয়া ও সিরদারিয়া। গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয়ে। এটি পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। কমিশন বিশ্বের মাত্র দুটো নদীর প্রবাহকে 'স্বাস্থ্যসম্মত' বলে অভিহিত করে। নদী দুটো হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন এবং সাব-সাহারা আফ্রিকার কঙ্গো। নদী দুটো শিল্প কর্মকাণ্ড থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছে।

২০০৬ সালের ২৮ মে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) এক খবরে বলা হয়, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীর পানিদূষণের কারণে রাজধানীর এক কোটির বেশি মানুষের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে ডাব্লিউএইচওমকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম মুজিবুর রহমান বাসসকে বলেন, অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ভূ-উপরিস্থ পানিদূষণ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

প্রথম আলোয় ২০০৩ সালের ৫ জুনের প্রতিবেদনে এবং পরদিনের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, বুড়িগঙ্গার পানির দূষণ এতটাই ঘটেছে যে, এই জলধারা বস্তুত এখন একটি নর্দমা, যা মাঝে মাঝে কেবল পচা দুর্গন্ধই ছড়ায় না, 'ওষুধের গন্ধ'ও ছড়ায়। অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা ঢাকা শহরের নানা রকম বর্জ্যের সঙ্গে শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য নিক্ষেপেরও জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বুড়িগঙ্গার তীরে বসবাসকারী গরিব মানুষদের তাই 'ভাতের চেয়েও পানির কষ্ট বেশি'। নদীদূষণ শুধু বুড়িগঙ্গাতেই সীমাবদ্ধ নেই। ছোট-বড় যেকোনো শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রায় সব নদীই নানা মাত্রায় দূষণের শিকার। এমনকি মেঘনার মতো নদীও দূষণের বাইরে নেই।

শুধু নদী নয়, সাগরের পানিও দিন দিন দূষিত হয়ে পড়ছে। ২০০৯ সালের ৯ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠে 'বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ দূষণ ॥ কক্সবাজারে টন টন শামুক মরে ভেসে উঠছে তীরে' শীর্ষক এক খবরে বলা হয়, বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ কারণে সাগরে বিভিন্ন সময়ে মাছের ব্যাপক মড়কের পর এবার শামুক মরে তীরে উঠে আসছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সাগরের শামুক উঠে আসছে তীরে। মণ মণ নয়, একেবারে টন টন শামুক। কয়েক দিন পর একই দৈনিকে 'সাগর থেকে এখনও মরা শামুক ভেসে আসছে ॥ মড়ক রহস্য উদঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, 'সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে দেখা গেছে জোয়ারের পানিতে সাগর থেকে বিপুল পরিমাণ মরা শামুক ভেসে আসার দৃশ্য।'

বিভিন্ন কল-কারখানার বর্জ্যের বিষক্রিয়ায় ১৯৯৫ সালের ২০ মার্চ সাভার উপজেলা ও পৌর এলাকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বংশী, ধলেশ্বরী ও তুরাগ নদীর মাছ মরে ভেসে ওঠে। নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি অস্বাস্থ্যকর বলেই গভীর-অগভীর নলকূপের সাহায্যে মাটির নিচের পানি তুলে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বড় শহরগুলোতে প্রাকৃতিক জলাশয় নেই বললেই চলে। শহরে তাই ভূ-গর্ভস্থ পানি তুলে সরবরাহ করে ওয়াসা। কিন্তু এ পানিও এখন আর নিরাপদ নয়। ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে ওয়াসার পানিতে ক্ষতিকর রোগজীবাণুর উপস্থিতি আশঙ্কাজনক মাত্রায় বিদ্যমান। ১৯৯৬ সালে এ বিষয়ে একটি জরিপ চালায় পরিবেশ অধিদপ্তর। ঢাকার পুরানা পল্টন, নয়া পল্টন, কাকরাইল, সিদ্ধেশ্বরী, মগবাজার, গ্রিন রোড, ঝিগাতলা ও স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকায় ঢাকা ওয়াসার সরবরাহ করা পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয় ৩৯টি। এর মধ্যে ২১টি নমুনাতেই গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি কলিফর্ম জীবাণু পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয়, এ পানি পান করার অনুপযোগী।

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এবং ইঞ্জিনচালিত নৌযানের তেলও পানিদূষণ ঘটায়। গত ১১ জানুয়ারি ডয়েচেভেলের ওয়েবসাইটে প্রচারিত এক খবরে বলা হয়, 'তেল চুঁইয়ে পড়ার কারণে দূষণের ঘটনা চীনে নতুন নয়। আবারো ব্যাপকভাবে তেল নির্গমনের কারণে চীনে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। গত সোমবার পাইপ লাইন ফেটে যাওয়ায় তা থেকে চুঁইয়ে পড়া ডিজেল পীত নদীতেও পৌঁছে যায়। বর্তমানে পানি দূষণের সঙ্গে সঙ্গে এই দূষণ নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেও লড়ছে চীন। দেশটির এক শীর্ষস্থানীয় তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ডিজেলের পাইপ লাইন ফেটে যাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে,

বিশ্ববাসীর নজর এখন চীনের দিকে। যদিও প্রতিষ্ঠানটি এ ঘটনার জন্য দায়ী করছে তৃতীয়পক্ষকে। ফাটল থেকে ডিজেল নদীতে ছড়িয়ে পড়ায় পরিবেশের জন্য বড় রকমের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ পীত নদী হল চীনের সবচেয়ে বড় নদী এবং লাখ লাখ মানুষের পানীয় জলের একমাত্র উৎস। ২০১০ সালের ৩০ ডিসেম্বর দেড় লাখ লিটার ডিজেল চুঁইয়ে পড়ে চিশুই এবং ওয়াই নদীতে। সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে যায় পীত নদীতে। বেইজিংয়ের ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যাফেয়ার্স-এর পরিচালক মা জুন জানান, খাওয়ার পানির সঙ্গে তেলের মিশ্রণ ক্ষতিকর। ডিজেল মিশ্রিত পানি মানুষের জন্য নিরাপদ নয়। এখন পাইপলাইনের ফাটল থেকে ডিজেল যেন আরো বেশি ছড়িয়ে না পড়ে সে চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তেল সরবরাহ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনও বন্ধ রাখা হয়েছে। আর নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের সরাসরি নদীর পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তেল ছড়িয়ে পড়ে নদীর পানি দূষিত হওয়ায় পানীয় জলের বিশুদ্ধতার মাত্রা পাঁচে নেমে এসেছে। এমনকি চীনেও গুণগত মানের দিক থেকে এই মাত্রা সবচেয়ে নিচু বলে বিবেচিত। এ পানি পানের উপযোগী নয়।'

খবরে আরো বলা হয়, চীনে প্রতিদিন গেরস্থালি কাজ ও শিল্পকারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য-পানি নদীতে এসে পড়ছে। বড় কিছু শহর ছাড়া অন্য শহরগুলোতে বর্জ্য-পানি বেরুনোর আগে তা ঠিকমতো শোধন করা হয় না। এ কারণে খাওয়ার পানিসহ কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে। চীনে ৪০ লাখ হেক্টর জমিতে এ দূষিত পানি দিয়েই সেচকাজ চালানো হয়। বিশ্বে দূষিত পানির সাহায্যে সেচকাজ চালানোর এটাই সবচেয়ে বড় এলাকা।

শিল্প ও পৌর বর্জ্য বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলোক দূষিত করছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চট্টগ্রামের টিএসপি সার কারখানা থেকে সালফিউরিক ও ফসফরিক এসিড এবং চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি কাগজ মিল, সিলেট কাগজ মিল, দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, খুলনার শিপাইয়ার্ড ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, ঢাকার অলিম্পিক ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লাখ লঅখ গ্যালন তরল বর্জ্য পার্শ্ববর্তী নদী ও জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পানি দূষণ ঘটাচ্ছে।

কয়েক বছর আগের হিসাব অনুযায়ী, চট্টগ্রামের কালুরঘাট, নাসিরাবাদ, পতেঙ্গা, কাপ্তাই, ভাটিয়ারি, বাড়বকুণ্ড, ফৌজদারহাট ও ষোলশহরের ১৪০টিরও বেশি শিল্পকারখানার বর্জ্য কর্ণফুলি নদী ও বঙ্গোপসাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। চট্টগ্রামে ১৯টি চামড়া শিল্প, ২৬টি বস্ত্রকল, একটি তেল শোধনাগার, একটি টিএসপি সার কারখানা, দুটি রাসায়নিক কারখানা, পাঁচটি মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, দুটি

সিমেন্ট কারখানা, একটি পেপার রেয়ন মিল, একটি ইস্পাত মিল, দুটি সাবান কারখানা, দুটি কীটনাশক কারখানা, চারটি রঙের কারখানা এবং প্রায় ৭৫টি অন্যান্য ছোট শিল্প কারখানা রয়েছে। পোস্তগোলা ও ফতুল্লার ৫৩টি কারখানা এবং হাজারীবাগের ১৫১টি চামড়া শিল্পের বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি। চামড়া শিল্পের বর্জ্যে সালফিউরিক এসিড, ক্রোমিয়াম, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়ামের অক্সাইড থাকে। এগুলো চুয়ানোর মাধ্যমে ভূগর্ভের পানিতে মিশে মাটির উপরের ও নিচের পানির উৎসকে দূষিত করতে পারে। ট্যানারির দুর্গন্ধ আশপাশের মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। অন্তত ২৯টি শিল্পকারখানা টঙ্গী অঞ্চলের তুরাগ নদী এবং ৪২টি বৃহৎ শিল্প শীতলক্ষ্যা নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ করে।

খুলনার রূপসা শিল্পনগীর বেশ কয়েকটি শিল্প ও দিয়াশলাই কারখানা রূপসা নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ করে দূষণ ঘটাচ্ছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, খালিশপুরের পাট ও লোহাশিল্প কারখানাগুলো তাদের উৎপাদিত যাবতীয় বর্জ্য ভৈরব নদীতে ফেলছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল ঘণ্টায় প্রায় ৪,৫০০ ঘনমিটার বর্জ্যমিশ্রিত পানি ভৈরব নদীতে ফেলে। শহরাঞ্চলের শিল্পবর্জ্য ছাড়াও গঙ্গার উজানের নিক্ষিপ্ত বর্জ্যমিশ্রিত পানিতে পদ্মাও দূষিত হয়ে পড়ছে। গঙ্গা ভারত থেকে প্রায় ৮,৬২,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত গঙ্গা অববাহিকার বর্জ্য বয়ে নিয়ে আসে। তীরবর্তী ৭০০ শহরের প্রায় ১২০ কোটি লিটার বর্জ্য প্রতিদিন গঙ্গা নদীর প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং ভাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশের মানুষ সেই দূষিত পানি ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীতে মাছের বংশবৃদ্ধি পানি দূষণের ফলে হ্রাস পেয়েছে এবং রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, বোয়ালখালী ও আনোয়ারা উপজেলার অনেক মৎস্যজীবী বেকার হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট থেকে কুমিরা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার উপকূল জুড়ে রয়েছে 'জাহাজ ভাঙা শিল্প'। জাহাজ ভাঙার সময় প্রচুর পরিমাণ অব্যবহৃত ইঞ্জিন তৈল ও তলায় সঞ্চিত তৈল বঙ্গোপসাগরে পড়ে এবং বিস্তৃত অঞ্চলের পানি দূষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ধাতু সমুদ্রের পানিতে মিশে পানি আরও দূষিত হয়। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে যাতায়াতকারী জাহাজগুলো কঠিন ও তরল বর্জ্য নির্বিচারে সাগরে ফেলে নিয়মিত পানির দূষণ ঘটাচ্ছে। মংলা বন্দর অভিমুখী জাহাজগুলো সুন্দরবনের ভিতর পশুর নদী দিয়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার সময় পানিতে তরল ও কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ করে বনাঞ্চলে দূষণ ঘটায়।

২০০৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর ইউকেবিডিনিউজ ডটকমের এক খবরে বলা হয়, চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনাস্থ কর্ণফুলী পেপার মিলের (কেপিএম) লাগামহীন গ্যাস ও

দূষিত বর্জ্য কর্ণফুলী নদীতে নির্গমনের ফলে পানিদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দৈনিক ৫০ টনের বেশি রাসায়নিক গ্যাস ও বর্জ্য নদীর পানিতে পড়ার ফলে প্রায় ১০ কিলোমিটার নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়েছে। বিষাক্ত গ্যাস ও বর্জ্যের সংমিশ্রণে এ পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। মানুষের ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্যে সহনীয় মাত্রা শতকরা ৭ ভাগ পিএইচ এর স্থলে এখন কর্ণফুলী নদীর পানিতে শতকরা ১১ থেকে ১৯ ভাগ পিএইচ ধরা পড়েছে বলে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে। ফলে এ নদীর পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানিদূষণের কারণে কর্ণফুলী নদী মাছশূন্য হয়ে পড়ছে।

নীরব ঘাতক আর্সেনিক : ইস্পাত-ধূসর আভাযুক্ত সাদা রংয়ের এক তীব্র বিষের নাম আর্সেনিক, যা ভূ-তলে ছড়িয়ে থাকে। ভৌত গুণের দিক দিয়ে এটি আধাধাতু বা উপধাতু হলেও অধাতব পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এর কোনো গন্ধ বা বিশেষ স্বাদ নেই। প্রকৃতিতে বিভিন্ন যৌগ আকারে আর্সেনিক প্রচুর পরিমাণে থাকে। মানবদেহ, সমুদ্র ও মাটিতে আর্সেনিক থাকে খুবই সামান্য পরিমাণ। আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার চেয়ে পাললিক শিলায় আর্সেনিকের পরিমাণ সাধারণত বেশি থাকে। আগাছানাশক ও কীটনাশক হিসেবে কীটনাশকের ব্যবহার আর্সেনিক দূষণের প্রধান উৎস।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, পানিতে আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার। টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিকের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা প্রতিলিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম। এর বেশি আর্সেনিক থাকলে তা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর আর্সেনিক বিষক্রিয়া (আর্সেনিকোসিস) দিনে দিনে ভয়ানক রূপ নিয়ে থাকে। এমনকি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়।

আর্সেনিকে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে হাতে ও পায়ের তলায় বাদামী রংয়ের ছোপ এবং কালো ক্ষত চিহ্ন দেখা দেয়। চামড়ার উপরেও একই ধরনের দাগ পড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হয়। নষ্ট হয়ে যায় কিডনির কার্যকারিতা। দেখা দেয় ভাইরাল হেপাটাইটিস। নার্ভ সিস্টেম ও হরমোন আক্রান্ত হয়। ধীরে ধীরে লোপ পায় জীবনীশক্তি। একই সঙ্গে বহুমুখী জটিলতা দেখা দেয় এবং শেষে ক্যান্সার ও মৃত্যু অবধারিত। উচ্চ মাত্রার আর্সেনিক (খাদ্য ও পানিতে ৬০০০০ পিপিবির বেশি) মৃত্যু ঘটায়। যদি কেউ নিম্ন মাত্রার আর্সেনিক (খাদ্য ও পানিতে ৩০০-৩০০০০ পিবিবি) গ্রহণ করে, তাহলে পাকস্থলিতে ব্যাথা, অরুচি, বমি ও ডায়রিয়াসহ পাকস্থলি ও অন্ত্রে অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আর্সেনিক গ্রহণের ফলে আরো যেসব রোগ দেখা দেয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শারীরিক ক্লান্তি, অস্বাভাবিক হৃদকম্পন, রক্ত কণিকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ধমনী ধ্বংস, স্নায়ুর কার্যকারিতা হ্রাস ইত্যাদি। আর্সেনিকোসিসের ফলে হাতের তালু বা পায়ের তলায় কালো রংয়ের ছোট ছোট গুটি বা টিউমার বের হয়। এই গুটিগুলো

ক্যান্সারেও রূপ নিতে পারে। আর্সেনিক খাওয়ার ফলে লিভার, মূত্রথলি, কিডনি, জরায়ু, ফুসফুসে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

আর্সেনিকের কবলে পড়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য মানুষ। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এ সমস্যা প্রকট। ১৯৮৩ সালে এ সমস্যা প্রথম ধরা পড়ার পর ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ (SOES) ১৯৯৫ সালে এ বিষয়ে কলকাতায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলনে বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর জরুরি ভিত্তিতে জরিপ চালানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ও ভারতের এসওইএস ১৯৯৫ সালের আগস্ট থেকে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ নিরূপণে মাঠপর্যায়ে জরিপ চালায়। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ও ভারতের এসওইএসের কাছে বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণযুক্ত ৪৭টি জেলার ১৫,৯৬৯টি নলকূপের পানির বিশ্লেষণমূলক তথ্য রয়েছে।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের এক যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে এক কোটি ৮৫ লাখ থেকে দুই কোটি ২৭ লাখ মানুষ ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি ব্যবহার করছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ ফিল্ড কিট ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে দৈবচয়নভিত্তিক জরিপ চালায়। ৫১ হাজার নলকূপের পানি পরীক্ষা করে তারা ২৯ শতাংশ নলকূপে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রার আর্সেনিক দেখতে পায়। জাতীয় জরিপ ছাড়াও উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়েও কয়েকটি জরিপ চালানো হয়।

বাংলাদেশের সব কয়টি জেলায় পাঁচ বছর ধরে জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, ৫৪টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা প্রতিলিটারে ০.০১ মিলিগ্রামের বেশি। এগুলোর মধ্যে ৪৭টি জেলায় আর্সেনিকের মাত্রা অনুমোদিত সর্বোচ্চসীমার ওপরে। সবচেয়ে বেশি দূষণযুক্ত জেলাগুলো হচ্ছে চাঁদপুর (৯০%), মুন্সীগঞ্জ (৮৩%), গোপালগঞ্জ (৭৯%), মাদারীপুর (৬৯%), নোয়াখালী (৬৯%), সাতক্ষীরা ৯৬৭%), কুমিল্লা (৬৫%), ফরিদপুর (৬৫%), শরীয়তপুর (৬৫%), মেহেরপুর (৬০%), ও বাগেরহাট (৬০%)।

গত বিশ বছর ধরে পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের দুর্যোগ মোকাবিলা করছে বাংলাদেশ। বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ জেলায়ই এটি ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টিই মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার ফলে এটি দ্রুত ছড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের মতো বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এত বেশি লোক আর্সেনিক ঝুঁকির মধ্যে নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এরইমধ্যে আর্সেনিক

বিষক্রিয়াকে মহাপ্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে ঘোষণা দিয়েছে।

১৯৮০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা আর্সেনিক দূষণের কারণ খোঁজার চেষ্টা করলেও ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ সমস্যাটি ব্যপক গণসচেতনতার বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। জরিপ চালিয়ে বাংলাদেশে শতভাগ আর্সেনিকমুক্ত কোনো জেলা পাওয়া যায়নি এবং ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টিতে এটি ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশের ৫০%-৬০% গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিক রয়েছে বিপজ্জনক মাত্রায়। দুই থেকে তিন কোটি মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। আর্সেনিকের ভয়াবহতা সত্ত্বেও এখনো সংক্রমিত এলাকার মানুষেরা এর চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত নন। অন্যদিকে এ ভয়াবহ নীরব ঘাতকটি সম্পর্কে সরকারও জোরালোভাবে কোনো গনসচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্যোগ নিচ্ছে না। যদিও কিছু সরকারি-বেসরকারি সংগঠন আর্সেনিকমুক্ত বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে, কিন্তু বাস্তবে এই দানব আকারের সমস্যার বিপরীতে এটি খুবই ছোট প্রয়াস। এতে করে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিশেষ করে আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামাগুলো মহা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা : আর্সেনিক সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় গ্রামের অনেক সাধারণ মানুষ এখনো মনে করে এটি সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ, কেউ বলে এটি তার অতীত কর্মফলের শাস্তি, কারো কারো ধারণা আর্সেনিকোসিস ছোঁয়াছে রোগ। আর্সেনিকোসিসকে কুষ্ঠ রোগ বলার মতো লোতও অনেক আছে।

আর্সেনিকোসিসের সামাজিক প্রভাব : আর্সেনিকোসিস রোগের কারনেণ সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে। নারীদের নির্বাসিত করা হয় অথবা বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। আক্রান্তদের এড়িয়ে চলে প্রতিবেশীরা। আক্রান্তরা মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হন। মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীরা আর্সেনিক আক্রান্ত স্ত্রীদের ঘৃণা করে, এমনকি তালাক দেয়। আক্রান্ত শিশুর শারীরিক ও মানসিক বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতের গবেষণায় বলা হয়, আর্সেনিক আক্রান্তের ফলে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় পরিবারের আয় কমে যায়। কৃষিকাজে দিনমজুর হিসেবে না নেওয়ায় অথবা মজুরি কম দেওয়ায় অথবা ছোঁয়াছে রোগ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার ফলে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের পেশার পরিবর্তন ঘটে। শ্রমবাজারে চরম বৈষম্য দেখা দেয়। বঞ্চনা বেড়ে যায় আক্রান্ত বয়োবৃদ্ধদের। দরিদ্র আক্রান্ত মানুষের স্বাস্থ্যখাতে পারিবারিক ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে কমে যায় খাদ্য গ্রহণ। এভাবে মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে, যা থেকে বেরিয়ে আসার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে আর্সেনিকমুক্ত পাণীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা।

বাঁধ মানেই মরণফাঁদ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ কিংবা সস্তায় জলবিদ্যুৎ পাওয়ার আশায় দেশে দেশে এতকাল বাঁধ নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলেছে রীতিমতো। আর এ অশুভ প্রতিযোগিতায় অঢেল অর্থ ও ইন্ধন দিয়েছে বিশ্বব্যাংসহ আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। বাঁধ নির্মাণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে আটকে দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়ে মানুষ একধরনের আত্মতৃপ্তিও পেয়ে এসেছে এত দিন। বিশাল আকৃতির বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি বড় দেশগুলোর কাছে এমনকি মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়। বাঁধ নির্মাণ করে এর পেছনের এলাকায় পানি সংরক্ষণের পর উঁচু ঢাল থেকে সেই পানি টারবাইনের ওপর ফেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে তাতে খরচ পড়ে খুবই কম। কেননা বাঁধ নির্মাণসহ প্রকল্পের শুরুতে যে পরিমাণ অর্থ লাগে, তা দিয়ে চলে যায় বহু বছর। প্রকল্প চালু হওয়ার পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর কোনো জ্বালানি বা কাঁচামালের দরকার হয় না। প্রকৃতির দান পানিই সে প্রয়োজন মেটায়। এ ছাড়া বাঁধের পেছনে যে বিশাল কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়, তা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ওই হ্রদে গড়ে তোলা যায় মাছের খামার। পাশাপাশি শুকনো মৌসুমে জলাধার থেকে প্রয়োজনমতো পানি ছেড়ে বাঁধের পাদদেশে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলি জমিতে সেচ দেওয়া যায় অনায়াসে। নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে পরিবেশ সহায়কও মনে করা হতো এতকাল। এসব কারণে বিভিন্ন দেশে বাঁধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। কে কার চেয়ে কত বড় বাঁধ নির্মাণ করল, কত হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হলো, কত লাখ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এল ইত্যাদি আলোচনা জাতীয় গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু যেসব বাঁধকে একসময় আশীর্বাদ মনে করা হতো, সেগুলোই এখন মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফলে দেশে দেশে জোরদার হয়ে উঠছে বাঁধবিরোধী আন্দোলন। এমনকি খোদ বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করেছে যে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঁধ নির্মাণের ওপর বেশি জোর দেওয়াটা ছিল ভুল। বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, যেখানে সেখানে বাঁধ নির্মাণের দরুন অর্থনৈতিক ক্ষতি, স্থানীয় লোকজনকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের ফলে সামাজিক ক্ষতি এবং অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি হয়।

বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৪ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ওই সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ১৫ থেকে ১৫০ মিটার উঁচু বড় আকারের বাঁধের সংখ্যা

ছিল প্রায় ৩০০। এ ধরনের বাঁধ নির্মাণের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৪০ লাখ মানুষ তাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। মোট বাস্তুহারার সংখ্যা প্রায় আট কোটি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকায় ঘরছাড়া এসব মানুষের জীবনে নেমে এসেছে কঠিন দুর্ভোগ।

বাঁধ নির্মাণের উপযোগিতা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গঠন করা হয় বিশ্ব বাঁধ কমিশন (The World Comission on Dams)। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বাধীন ওই কমিশন দুই বছর ধরে জরিপ চালিয়ে যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তাতে বিশ্বের প্রায় ৪৫ হাজার বড় বাঁধ ও জলাধারের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়াকে হতাশাব্যঞ্জক বলে অভিহিত করা হয়। এসব বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের লক্ষ্য ছিল একদিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অন্যদিকে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, মাছের চাষ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রিত জল নিষ্কাশনব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবে এসব লক্ষ্য অর্জিত হয়নি এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এসব বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব বাঁধ কমিশন।

২০০০ সালে প্রকাশিত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রিত জল নিষ্কাশনব্যবস্থা সম্প্রসারণের বদলে জলাধারগুলো জলাবদ্ধতা এবং মাটির নিচের খনিজ লবণ ভূপৃষ্ঠে তুলে আনার মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লবণাক্ততা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে জমি অনুর্বর হয়েছে এবং জলাবদ্ধতায় বিপন্ন হয়ে উঠেছে পরিবেশ। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় নদী ও জলাশয়গুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণির বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে। বিলুপ্তির মুখে পড়েছে কোনো কোনো প্রজাতি। পলি জমে আবদ্ধ জলাশয়গুলোর পানি ধারণক্ষমতা যেমন দিন দিন কমেছে, তেমনি বাঁধের কারণে নদীর স্রোতধারায় উজান থেকে আসা গাছপালা, লতাগুল্মা, পাতা, প্রাণিদেহসহ পচনশীল জৈব পদার্থ জমে জলাধারগুলো থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস, বিশেষত কার্বন ডাই-অক্সসাইড ও মিথেন নিঃসরণ বেড়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, সাম্প্রতিককালে বায়ুমণ্ডলের ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার এক-চতুর্থাংশ আসছে বাঁধের পেছনে তৈরি জলাধার থেকে। ১৯৯৮ সালে তুরস্কের টুকুরি নদীর ওপর নির্মিত একটি বাঁধের পেছনে দুই হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার জলাধারে এক বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে ৭৬ টন মিথেন এবং তিন হাজার ৮০৮ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওই প্রকল্প থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন না করে অর্থাৎ বাঁধটি ওই অবস্থায় না রেখে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে পরিবেশদূষণ অনেক কম হতো।

বিনিয়োগ এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাত বিশ্লেষণেও বড় বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ প্রকল্পগুলোকে এখন 'শ্বেত হস্তী' হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুন সাগর প্রকল্প এর বড় দৃষ্টান্ত। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯১ কোটি রুপি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ৮৪৪ কোটিতে গিয়ে ঠেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ প্রকল্পের আওতায় জমির ৭০ শতাংশ পর্যাপ্ত এবং যথাসময়ে পানি সরবরাহ পেতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকল্পের পরিকল্পনায় এর আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছিল ১০০ বছর। কিন্তু ব্যাপক পলি জমে জলাধারের তলদেশ ভরাট দ্রুত হওয়ায় তা অর্ধেক সময়ও কার্যকর থাকবে কি না, তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

বাঁধের কারণে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় তলদেশ স্ফীত হওয়া এবং অনিয়ন্ত্রিত বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি সংশ্লিষ্ট এলাকায় বরং বিপদ বাড়াচ্ছে। বাঁধ নির্মাণের আগে নদীর স্রোতধারা, বন্যার ঢাল ও বৃষ্টির পানির তোড়ে সব ধরনের জঞ্জাল, লবণাক্ততা ও বর্জ্য তুমুল বেগে গিয়ে পড়ত সাগরে। এতে কৃষিজমির লবণাক্ততা সরে যেত এবং জমির ওপর নতুন পলি পড়ে বাড়ত উর্বরতা। কিন্তু বাঁধের কারণে জলাধারে পানিপ্রবাহ আটকে যাওয়ায় লবণাক্ততা নিকাশের পথ থাকছে না। জমির পানিপ্রাপ্তির স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বাঁধসংলগ্ন এবং ভাটির দিকের জমির উর্বরতা যাচ্ছে কমে। নীল নদের ওপর নির্মিত আসওয়ান বাঁধ কিংবা নাইজার নদের কাইনজি বাঁধ অথবা জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়েকে আলাদা করা জাম্বেসি নদীর ওপর নির্মিত কারিবা বাঁধের পর্যালোচনা প্রতিবেদনগুলো প্রায় একই সাক্ষ্য বহন করছে।

থাইল্যান্ডের পাক মুন বাঁধ ওই এলাকায় মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব বাঁধ কমিশনের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্প থেকে ১৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা থাকলেও পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২০ দশমিক ৮১ মেগাওয়াট। ওই জলাধারে বছরে প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি মাছ উৎপাদন হওয়ার কথা, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১০ কেজি।

বিশ্বের অধিকাংশ বড় বাঁধই এখন পরিবেশবাদীদের তোপের মুখে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য ইউরোপের দানিউব বাঁধ, ভারতের নর্মদা বাঁধ, চীনের থ্রি জর্জেস ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। স্থানীয় জনসাধারণ তো বটেই, এমনকি দেশের এবং বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিরাও সম্পৃক্ত হচ্ছেন বড় বাঁধ নির্মাণ ঠেকানোর আন্দোলনে। ভারতের নর্মদা বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণ করতে হয়েছিল বুকার পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী রায়কে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই হোক আর সেচের জন্যই হোক, কোনো বাঁধই দীর্ঘ মেয়াদে সুফল বয়ে আনে না। চীন ও ভারতের বাঁধগুলো এরই প্রমাণ। বিশ্বের বড়

বাঁধগুলোর বেশির ভাগই এ দুটি দেশে। কেবল চীনেই নির্মিত হয়েছে ২২ হাজার বাঁধ, যা বিশ্বের মোট বাঁধের প্রায় ৫৫ শতাংশ। সে দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাঁধটির নির্মাণকাজও শেষ হওয়ার পথে। বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী ইয়াংশির ওপর তৈরি হচ্ছে এ বাঁধ। প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ইয়াংশি নদীর জলপ্রবাহের উচ্চতা হবে ৬০০ ফুট। তখন ২০ লাখ মানুষকে বাঁধ এলাকা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে চীনে ১৮ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। তবে পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এ প্রকল্পের কারণে দেশটিতে দেখা দিতে পারে পরিবেশগত বিপর্যয়। এরই মধ্যে দেশটির অনেক বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প ভেস্তে গেছে। চীনের হেনান প্রদেশে ১৯৫০ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল ১১৮ মিটার উঁচু বানকিয়াও বাঁধ। নানা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৫ সালের আগস্টে অতিবৃষ্টির কারণে ধসে গিয়েছিল বাঁধটি। বাঁধ ভেঙে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও সাত মিটার উঁচু জলরাশি ৫০ কিলোমিটার বেগে নিচের দিকে ধেয়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিক মারা গিয়েছিল ২৬ হাজার লোক। পরে আরো এক লাখ ৪৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এ বাঁধ ধসের কারণে। ওই সময় মোট ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ছিল এক কোটি ১০ লাখ। ভারতেও বিভিন্ন সময়ে বাঁধ ধসের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫৮ সালে অন্ধ্র প্রদেশে বন্যার পানির তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল কাদ্দাম বাঁধ। ১৯৫৯ সালে গুজরাটে কয়লা বাঁধ ভেঙে যায় একই কারণে। ওই রাজ্যে ১৯৭৯ সালে ভেঙে যায় মাচ্ছু-২ বাঁধ। পাঞ্জাবে ১৯৬৭ সালে নানক সাগর বাঁধ ধসে পড়ে। ১৯৬০ সালে ভেঙে যায় মহারাষ্ট্রের পানসেট বাঁধ। একই রাজ্যের খাদ কিওয়াসলা বাঁধ ভেঙে যায় ১৯৬১ সালে।

বাংলাদেশে বড় বাঁধ বলতে গেলে একটিই, সেটি হলো কাপ্তাই বাঁধ। সস্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ষাটের দশকে নির্মিত হয় এ বাঁধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক জাতিগত সংঘাত ও সম্পদহানির জন্য প্রধানত এ বাঁধই দায়ী। এর ফলে যে পরিমাণ বনভূমি উজাড় হয়েছে এবং জলমগ্ন হয়ে আরো যে পরিমাণ ভূমি বনায়নের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, এর ক্ষতি পূরণ করা কঠিন। কাপ্তাই ছাড়া বাংলাদেশে বড় কোনো বাঁধ নির্মিত না হলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গত শতকের ষাটের দশক থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর উৎসমুখ বন্ধ করে অসংখ্য স্লুইসগেট ও পোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। নদীর গতিপথ বন্ধ করে নির্মাণ করা হয়েছে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা। এসবের ফলে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে গেছে। ফলে বছর বছর দেখা দিচ্ছে বন্যা। দেশের হাওরাঞ্চলেও নদী, খাল, বিল খনন না করে শুধু বেড়িবাঁধ নির্মাণ করায় প্রতিবছর পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাচ্ছে ওই অঞ্চলের একমাত্র বোরো ফসল।

যশোর জেলার কেশবপুর, মনিরামপুর ও অভয়নগর থানার কিছু অংশে জলাবদ্ধতার কারণে লাখ লাখ মানুষ দিশেহারা। ১৯৯৭ সালে জেলার কেশবপুর থানার ৯টি ইউনিয়নের মোট ৯৪৩ গ্রামের মধ্যে ৭৫টি পানির নিচে তলিয়ে যায়। শুধু কেশবপুর থানায় এক লাখ ২০ হাজার ২৭৩ জন অধিবাসী জলাবদ্ধতার শিকারে পরিণত হয়। মনিরামপুর থানার মনোহরপুর ইউনিয়নের চারটি গ্রাম, দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের ১৭টি গ্রাম, বড়খানের ১০টি গ্রামসহ আরো কয়েকটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের ঘরবাড়ি তলিয়ে যায় পানির নিচে। এ এলাকার অধিকাংশ কাঁচা বাড়িঘর ধসে পড়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। চাষযোগ্য সব জমি এখন পানির নিচে। ১৯৮৬ সাল থেকে এ জলাবদ্ধতা সমস্যা দেখা দিলেও ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কয়েক বছর ধরে এসব এলাকায় ফসল হয় না। এদিকে তীব্র জ্বালানি সংকটে লোকজন কোনো রকমে খাবার সংগ্রহ করলেও তা সেদ্ধ করতে পারছে না। চারদিকে পানি থাকায় অনেককে বিষধর সাপে কামড়াচ্ছে। তা ছাড়া এলাকায় সংক্রামক ব্যাধি যেমন– আমাশয়, ডায়রিয়া প্রভৃতির প্রকোপ বাড়ছে। এ এলাকার জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষ চিহ্নিত করছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মাণ করা অপরিকল্পিত বেড়িবাঁধ, রাস্তা, কালভার্ট ও স্লুইসগেটকে। এ ছাড়া ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার কয়েকটি ইউনিয়নের ৫০ হাজার একর ফসলি জমি প্রশাসনের যোগসাজশে স্বার্থান্বেষী মহলের নির্মাণ করা বাঁধের দরুন সৃষ্ট জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এলাকার ক্ষুব্ধ কৃষক-জনতা সংঘবদ্ধভাবে সাতটি বাঁধ কেটে দেয়। পূর্ববর্তী প্রায় তিন বছর ধরে সেখানে জলাবদ্ধতাজনিত দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল এলাকাবাসী। অপরিকল্পিত এবং ক্ষেত্রবিশেষ অবৈধভাবে নির্মিত বাঁধজনিত সংকট শুধু স্থানীয় ঘটনাই নয়, সারা দেশ আজ এ সংকটের মাশুল গুনছে।

১৯৯৭ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর সফরের সময় বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বিইএন) দেশের পরিবেশগত সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি তার কাছে পেশ করে। স্মারকলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশ এখনো বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে আসছে। অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে এটি মোটেও সঠিক পথ নয়। যেহেতু বাঁধ নির্মাণ যে ধরনেরই হোক না কেন, তা ক) মোট পানির পরিমাণ হ্রাস করতে পারে না; খ) পানি নিষ্কাশনের অতিরিক্ত পথ ও পানি সংরক্ষণের জায়গা সৃষ্টি করতে পারে না; গ) এটি এক এলাকার বন্যা রক্ষার জন্য বাঁধের বাইরে অন্য এলাকায় বন্যা সৃষ্টি করে; ঘ) বাঁধের রক্ষাব্যূহের মাঝখানের মানুষের জীবন ও সম্পদের জন্য একটি সার্বক্ষণিক ঝুঁকি সৃষ্টি করে;

ঙ) রক্ষাব্যূহের মধ্যকার জমিকে বন্যার পানি ও পলির স্বাভাবিক উপকারী প্রভাব থেকে বঞ্চিত করে ওই এলাকার পরিবেশ ও ড্রেনেজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে এবং যেহেতু আমাদের শক্তিশালী নদীগুলো বারবার তাদের গতিপথ পরিবর্তন করবে, সেহেতু বাংলাদেশের পাললিক সমভূমির ওপর স্থায়ী বেড়িবাঁধ দীর্ঘমেয়াদি বিচারে অকার্যকর হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো মরে যাওয়া কিংবা ভরাট হয়ে প্রবাহ কমে যাওয়ার মূল কারণ অবশ্য ওই সব নদীর উজানে ভারতের বাঁধ নির্মাণ। গঙ্গা নদীতে ভারত বাঁধ (ফারাক্কা বাঁধ) দেওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের নদীগুলো মরে যাচ্ছে। এ বাঁধের কারণে দুর্ভোগ নেমে এসেছে খোদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো এলাকার মানুষের জীবনেও। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ড্যামস, রিভার্স অ্যান্ড পিপল (এসএএনডিআরপি)-এর ১৯৯৯ সালের নভেম্বরের এক সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ফারাক্কা বাঁধের কারণে মালদা জেলায় নদীভাঙন এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, তাতে কয়েকটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ঘরবাড়ি হারিয়েছে সাড়ে চার লাখ মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় বাংলাদেশ অভিমুখী তিস্তা নদীর প্রবাহসহ করতোয়া, মহানন্দা, আত্রাই ও ধরলা নদীর প্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর গঙ্গার পানি বণ্টনে চুক্তি হলেও তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে এখনো কোনো চুক্তি হয়নি। পঞ্চগড় জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত সব কটি নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত। ফলে বাংলাদেশ অংশের ওই সব নদীতে পানি নেই। তেঁতুলিয়া সীমান্তসংলগ্ন ফুলবাড়ীতেও নদীতে বাঁধ দিয়েছে ভারত।

ফারাক্কা বাঁধ : কলকাতা বন্দরকে পলির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের রাজশাহী সীমান্ত থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেরার জঙ্গীপুর গ্রামে গঙ্গা নদীর ওপর বাঁধ দেয় ভারত। এটি ফারাক্কা বাঁধ নামে পরিচিত। ১৯৬০ সালে এ বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও শেষ হয় ১৯৭০ সালে। চালু হয় ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গা প্রশ্নে জরুরি আলোচনা শুরু করে। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি)। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী এক যৌথ ঘোষণায় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, ফারাক্কা প্রকল্প চালু করার আগে গঙ্গায় বছরে সর্বনিম্ন প্রবাহের সময় নদীর জলবণ্টন প্রশ্নে দুই দেশ পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য একটি মতৈক্যে উপনীত হবে। ওই শীর্ষ বৈঠকে আরো

ঠিক হয় যে, শুকনো মৌসুমের পানি ভাগাভাগির পর্যায়ে দুই দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি হওয়ার আগে ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হবে না। ১৯৭৫ সালে ভারত বাংলাদেশকে জানায়, ফারাক্কা বাঁধের ফিডার ক্যানেল পরীক্ষা করা তাদের প্রয়োজন। সে সময় ভারত ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১০ দিন ফারাক্কা থেকে গঙ্গার প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ৩১০-৪৫০ কিউবিক মিটার প্রত্যাহার করার ব্যাপারে বাংলাদেশের অনুমতি চায়। বাংলাদেশ সরল বিশ্বাসে এতে সম্মতি দেয়। ভারত বাঁধ চালু করে দেয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরও একতরফাভাবে গঙ্গার গতি পরিবর্তন করতে থাকে যা ১৯৭৬ সালের পুরা শুকনো মৌসুম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়নে পলি ধুয়ে নিতে শুকনো মৌসুমে গঙ্গানদী থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগিরথী-হুগলী নদীতে ১১৩০ কিউবিক মিটারের বেশি পানি পৌঁছে দেওয়া।

ভারতকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয়। ১৯৭৬ সালের ২৬ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি সর্বসম্মত বিবৃতি গৃহীত হয় যাতে ভারতকে সমস্যার একটি ন্যায্য ও দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাগিদ দেওয়া হয়। এর জের ধরে কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর দুই দেশ ফারাক্কায় প্রাপ্ত শুকনো মৌসুমের জলবণ্টনের ওপর ৫ বছর মেয়াদি (১৯৭৮-৮২) একটি চুক্তি সই করে। ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে দুই দেশের মধ্যে ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য গঙ্গার জলবণ্টনসংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। কোনো সমঝোতা চুক্তি না থাকায় ১৯৮৫ সালে গঙ্গার জলের ভাগবাটোয়ারা হয়নি। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে দুই দেশের মধ্যে ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ এই তিন বছরের জন্য পানি বণ্টনের ওপর আরেকটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। বণ্টনসংক্রান্ত এই অস্থায়ী ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এলাকায় বিভিন্ন খাতে গঙ্গার পানির আরো অর্থবহ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

১৯৮৯ সালের পর শুকনো মৌসুমে জল ভাগাভাগির কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা চালু ছিল না। এই সুযোগে ভারত শুকনো মৌসুমে নদীর পানি ব্যাপকভাবে একতরফা প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে বাংলাদেশে গঙ্গার প্রবাহ দারুণভাবে হ্রাস পায়। হিসাবে দেখা যায়, প্রাক-ফারাক্কা আমলে মার্চ মাসে হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে যেখানে গঙ্গার প্রবাহ ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১৯৮০ কিউবিক মিটার, ১৯৯৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ২৬১ কিউবিক মিটারে। ১৯৯২ সালের মে মাসে দুই দেশের সরকার প্রধানের মধ্যে বৈঠকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীনভাবে আশ্বাস দেন যে,

ফারাক্কায় গঙ্গার পানি সমতার ভিত্তিতে বণ্টনের সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা চালানো হবে। সেই থেকে দুই দেশের মধ্যে দুটি মন্ত্রী পর্যায়ের এবং দুটি সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যদিও পানি বণ্টনসংক্রান্ত কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টনসংক্রান্ত একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

ভারত শুকনো মৌসুমে গঙ্গার পানির ব্যাপকভাবে প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের গঙ্গা-নির্ভর এলাকার জনগণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। মানুষের সৃষ্ট এই দুর্বিপাক দেশের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিদারুণ আঘাত হেনেছে। ভারত বছরের পর বছর শুকনো মৌসুমের মূল্যবান পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশকে আজো কৃষি, মৎস্য, বন, শিল্প, নৌপরিবহন, জলসরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কোনো কোনো হিসাবে বাংলাদেশের এসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি ডলার। পরোক্ষ ক্ষতি হিসাবে আনলে এই পরিমাণ আরো অনেক বেশি হবে।

বাংলাদেশে গঙ্গা ও এর শাখানদীগুলোর জলবিদ্যা ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ফারাক্কা বাঁধের পরবর্তী বছরগুলোতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গঙ্গার প্রবাহ কমার ফলে অত্যধিক পলি জমেছে যা নদীর বুক ভরাট করে নদীর খাড়িগুলোর পরিবহণ ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। ফলে বর্ষায় ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে। বাংলাদেশে গঙ্গার প্রধান শাখানদী গড়াইয়ের নিষ্কাশন মুখ জানুয়ারির প্রথম ভাগেই ভরাট হয়ে আসে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই নদীটি শুকনো মৌসুম জুড়ে শীর্ণকায় হয়ে থাকে। একসময়ের প্রমত্তা গঙ্গা শুকনো মৌসুমে পরিণত হয় অন্তঃপ্লাবী-স্রোতস্বিনীতে।

ফারাক্কা-উত্তর বছরগুলোতে খুলনায় অত্যধিক লবণাক্ততার আক্রমণ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, কেন্দীকরণ ও মেয়াদ সর্বাধিক মাত্রায় নির্ভর করে এই অঞ্চলে বাহিত নিম্নমুখী প্রবাহের পরিমাণ ও মেয়াদের ওপর। শুকনো মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহে হ্রাসমান প্রবণতার কারণে এ সময়ে গড়াই-মধুমতি খুব কম পানি পায়। ফলে লবণাক্ততা দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে। ১৯৮৩ সালে ৫০০ মাইক্রো-এমএইচও (লবণাক্ততা) রেখা কামারখালির প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে এবং পশুর নদীর মোহনা থেকে ২৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে পৌঁছে যায়। খুলনায়ও ১৭,১০০ মাইক্রো-এমএইচও লবণাক্ততা দৃশ্যমান হয়। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ খুলনা এলাকায় রূপসা নদীর জলের উপরিভাগে ৫৬৩.৭৫ মিগ্রা/লি. ক্লোরাইড কেন্দীভবনের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাদুপানির প্রবাহ হ্রাস নদী প্রবাহের

লবণাক্ততার ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে এটি তারই ইঙ্গিতবহ। শুকনো মৌসুমে স্বাদু পানির সরবরাহ কমার কারণে ভূগর্ভস্থ পানিস্তরে নোনাপানির অনুপ্রবেশ ঘটে। হ্রাসমান পৃষ্ঠপ্রবাহ অথবা এই অঞ্চলে জলের উপরিভাগে নোনাজলের অনুপ্রবেশ, পুনঃসঞ্চারণ, প্রত্যাহার ও প্রাকৃতিক অবমুক্তির বেগবান ভারসাম্যকে ক্ষুন্ন করবে। এই অঞ্চলের বর্তমান লবণাক্ততা এখানকার কৃষি, মৎস্য চাষ, রসায়ন ও শিল্প-কলকারখানাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে কৃষি। এ বাঁধ চালু হওয়ার পরবর্তী বছরগুলোতে গঙ্গার পানির সীমারেখা দ্রুত নেমে যাওয়ায় এ অঞ্চলের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের পাম্পমেশিন চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। ওই প্রকল্পের প্রত্যক্ষ এখতিয়ারে ১ লাখ ২১ হাজার ৪১০ হেক্টর জমি সেচনির্ভর। গঙ্গার প্রবাহ অত্যধিক নেমে যাওয়ায় প্রকল্পের অনেক পাম্প অচল হয়ে পড়ে। বাকিগুলো সামর্থ্যের চেয়ে অনেক কম শক্তিতে চলে। এছাড়া, মাটির আর্দ্রতা ও লবণাক্ততার ওপর অত্যধিক চাপ এবং নতুন ভূগর্ভস্থ জলের অভাব সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি কাজকে দারুণভাবে ব্যাহত করে।

মূল গঙ্গানদী ও এর শাখানদীগুলোতে পানির সংকট মাছের প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ প্রবাহ, স্রোত অবক্ষেপ, দ্রুতি, মোট দ্রবীভূত ঘনবস্তু ও লবণাক্ততার মাত্রাকে ব্যাহত করে। গাঙ্গেয় জলব্যবস্থায় দুই শতাধিক প্রজাতির মিঠাপানির মাছ এবং ১৮ প্রজাতির চিংড়ি লালিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ওই অঞ্চলে মাছের পরিমাণ কমে গেছে। ফলে অনেক জেলে ও মৎস্যজীবী বেকার হয়ে পড়েছেন।

ফারাক্কা বাঁধের কারণে গঙ্গার প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের নৌপরিবহণ খাত হুমকির মুখে পড়ে। শুকনো মৌসুমে ৩২০ কিলোমিটারের বেশি প্রধান ও মধ্যম নৌপথ বন্ধ রাখতে হয়। ফলে শত শত মাঝি-মাল্লা কর্মহীন হয়ে পড়েন। ফারাক্কা বাঁধের ফলে গঙ্গা-নির্ভর এলাকায় ক্ষীয়মাণ ভূগর্ভস্থ পানি অধিকাংশ স্থানে ৩ মিটারের বেশি নেমে গেছে। মোট দ্রবীভূত ঘনবস্তু, ক্লোরাইড, সালফেট ইত্যাদির ঘনত্ব বাড়ায় পানির গুণগত মানও কমে গেছে। ফলে বিশাল এলাকার কৃষিকাজ, কলকারখানা, গার্হস্থ্য ও পৌর জল সরবরাহ এবং মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জনগণ ১২০০ mg/L TDS (total dissolved solids) পানীয় জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে, যেখানে পানীয় জলের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত সীমা মাত্র ৫০০ mg/L TDS। জনসাধারণের সার্বিক স্বাস্থ্যের মান এ কারণে হ্রাস পাচ্ছে।

ফারাক্কা-উত্তর কালে ভূগর্ভস্থ পানির গতিপথ ধীরে ধীরে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। গঙ্গানদী বর্তমানে বছরের অধিক সময় ধরে, অর্থাৎ

জানুয়ারি থেকে জুলাই এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আশপাশের ভূগর্ভস্থ জলস্তর থেকে পানি সংগ্রহ করছে আর ভূগর্ভস্থ জলস্তরে আনুভূমিক পুনঃসঞ্চারন ঘটাচ্ছে মাত্র দুই কি তিন মাস। কিন্তু ফারাক্কায় গঙ্গার জল প্রত্যাহার শুরু হওয়ার আগে আশপাশের ভূগর্ভস্থ জলস্তর গঙ্গা থেকে অধিকতর সময় ধরে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি লাভ করত। এর অর্থ ফারাক্কা বাঁধ চালু করার পর গঙ্গানির্ভর অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল শুকিয়ে আসছে, যে কারণে গঙ্গা-নির্ভর অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের বিদ্যমানতা কমছে।

টিপাইমুখ বাঁধ হলে সর্বনাশ হবে : ভারতের মণিপুর রাজ্যের মিজোরাম সীমান্তের কাছে এক অখ্যাত জনপদের নাম টিপাইমুখ। তবে এখন জায়গাটির নাম উচ্চারিত হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ তো বটেই, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিবেশবাদীদের মুখে। এর কারণ একটাই—সেটি হলো, এই টিপাইমুখে বরাক নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে চায় ভারত। সে দেশের সরকার টিপাইমুখে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে, যদিও সেখানে বাঁধ নির্মাণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯২৯ সালে। প্রস্তাবিত এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি বা নিপকোকে। নিপকো ২০০৬ সালে এ বিষয়ে পরিবেশগত অনাপত্তি সার্টিফিকেটের জন্য ভারতের পরিবেশ দপ্তরে আবেদন জানায়। ওই আবেদন থেকে জানা যায়, প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো পাথর দিয়ে ১৬২.৮ মিটার উঁচু বাঁধ তৈরি করা, যা ১২ হাজার ৭৫৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের অববাহিকার বৃষ্টির পানি আটকাবে। এর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়েছে ১৫০০ মেগাওয়াট। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরেই প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, তবে দরপত্র চূড়ান্ত হয়নি।

উৎপত্তিস্থল থেকে টিপাইমুখ পর্যন্ত বরাক নদী পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর নদীটি নেমে এসেছে সমতলভূমিতে। টিপাইমুখে বরাকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে টুইভাই নদী। টুইভাই নদীর মুখ হলো টিপাইমুখ। টিপাইমুখে বরাক নদীর ডানতীরে মণিপুর রাজ্য, বামতীরে মিজোরাম। সেখান থেকে নদীটি আসামের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। উৎস থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বরাক নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬৪ কিলোমিটার। বাংলাদেশ সীমান্তে এসে নদীটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি ধারায় ভাগ হয়েছে।

টিপাইমুখে প্রস্তাবিত বাঁধটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মুখ্য (major) বাঁধ। ১৫০ থেকে ২৫০ মিটার উচ্চতার বাঁধকে মুখ্য বাঁধ বলা হয়। আর ১৫ থেকে ২০ মিটার উঁচু বাঁধ হলো বৃহৎ (large) বাঁধ। প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধের উচ্চতা বাংলাদেশের কাপ্তাই বাঁধের সাড়ে ছয় গুণ। টিপাইমুখে বিশাল জলরাশি একটি

সংকীর্ণ গিরিবর্তে ধরে রাখা হবে। কোনো কারণে এ বাঁধ ভেঙে গেলে ক্ষতি হবে অকল্পনীয়। ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে টিপাইমুখ খুবই স্পর্শকাতর এলাকা। সেখানে অবিরাম চলছে মহাদেশীয় ভূতাত্ত্বিক প্লেটের সংঘাত এবং ভূমির দেবে যাওয়া। এ রকম ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। এরই মধ্যে সেখানে রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে ১৬টি। এগুলোর দুটি ভূমিকম্প ৮.৫ মাত্রার চেয়েও বড়। এ দুটি ভূমিকম্প বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পের তালিকাভুক্ত। সঙ্গত কারণেই মণিপুর রাজ্যের জনগণ এ প্রকল্পের ঘোরতর বিরোধী। ভূমিকম্পে বাঁধ ভেঙে মহাবিপর্যয় নেমে আসার ঝুঁকি ছাড়াও এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ৬৭টি গ্রামের ১৫ হাজার আদিবাসী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবে ১৬টি গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও তাদের চিরায়ত জীবনযাত্রা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। মণিপুরবাসীর উদ্বেগের আরো কারণ হলো, ওই অঞ্চলে এ ধরনের প্রকল্প এরইমধ্যে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এ বাঁধ হলে তা হবে মণিপুরের জীববৈচিত্র্য সম্পদের জন্য বড় হুমকি। এসব কারণে মণিপুরবাসী এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সোসাইটি অব অ্যাক্টিভিস্টস ফর ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সেইফ) এবং সোসাইটি অব অ্যাক্টিভিস্টস অ্যান্ড ভলান্টিয়ার্স অব এনভায়রনমেন্ট (সেইভ)। বাঁধবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য মণিপুরে ২০টি সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন মিলে গঠন করেছে 'অ্যাকশন কমিটি অ্যাগেইনস্ট টিপাইমুখ ড্যাম'। এরই মধ্যে তারা রাজ্যজুড়ে শুরু করেছে আন্দোলন। মিজোরামেও চলছে আন্দোলন।

এদিকে সেইফসহ কাছাড়ের আরো ছয়টি সংগঠন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে এই বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের আবেদন জানিয়েছে।

বাঁধবিরোধীদের হিসাবে, টিপাইমুখে বাঁধ হলে ২৮৬ দশমিক ২০ কিলোমিটার এলাকা চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। ৪০ হাজার মানুষ জমি হারাবে। আটটি গ্রাম সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবে। ৯০টি গ্রাম কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৭ হাজার ২৪২ একর চাষের জমি বিলীন হবে। ব্যাহত হবে জুমচাষ।

সোসাইটি অব অ্যাক্টিভিস্টস অ্যান্ড ভলান্টিয়ার্স অব এনভায়রনমেন্টের (সেইভ) সম্পাদক ও সাংবাদিক পীযূষ কান্তি দাস ২০০৯ সালের নভেম্বরে প্রথম আলোকে বলেন, 'ওটা তো (টিপাইমুখ) একটা জলবোমা। ওয়াশড আউট করে দেবে বরাক ভ্যালিকে।' তার প্রশ্ন, কী প্রয়োজন আছে ৬,৩৫১ কোটি রুপি খরচ করে এই বাঁধ নির্মাণের? যেখানে মাত্র ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, সেখানে

এত টাকা খরচ করার কোনো কারণ নেই। পীযূষ আরো বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তো সরকার বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। তার আশঙ্কা, বাঁধ হলে বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা পানি পাবে না। এলাকায় শাক-সবজিসহ চাষাবাদ ব্যাহত হবে। এলাকার ১০টি চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে একমাত্র পেপার মিলটি। ধ্বংস হবে বনাঞ্চল। সাধারণ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। নদীপথ বাধাগ্রস্ত হবে। ইলিশ প্রজনন বাধাগ্রস্ত হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে বরাক নদীর ডলফিন। তাই তারা চান না বাঁধ হোক। বাংলাদেশের আপত্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'যখন অরুণাচলের অদূরে তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চীন বিশাল বাঁধ দিচ্ছে, তখন এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র আপত্তি তুলেছি। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশও টিপাইমুখ নিয়ে আপত্তি তুললে বাধা কোথায়?'

আসামের প্রধান রাজনৈতিক দল অসম গণপরিষদ (অগপ), এসইউসিআই, ইউডিএফ, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম পরিষদও চায় না বরাকে বাঁধ হোক। এ ছাড়া আসাম, মণিপুর ও মিজোরামের বহু রাজনৈতিক দল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বরাকে বাঁধ হোক তা চাইছে না।

কাছাড়ের সিপিএম নেতা তাপস ভট্টাচার্য প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের দলের অবস্থান যা-ই হোক না কেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বাঁধের বিরুদ্ধে। কারণ এই বাঁধ হলে বরাক উপত্যকার আদিবাসী ঐতিহ্য মুছে যাবে। পরিবেশ ভারসাম্য হারাবে। বাংলাদেশে নেতিবাচক প্রচার বাড়বে।'

মণিপুরের ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ও মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক নিবন্ধক আর কে রঞ্জন বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ হলে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য মুছে যাবে। বহু প্রজাতির উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পশুপাখি হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো। ইলিশের প্রজনন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।

মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানের অধ্যাপক সৈবাম ইবোটমবির মতে, ভূমিকম্পপ্রবণ টিপাইমুখে বাঁধ তৈরির মানে একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

টিপাইমুখে বাঁধ হলে বাংলাদেশের জন্যও তা সর্বনাশ ডেকে আনবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। অর্থনীতিবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান সম্প্রতি এক নিবন্ধে লিখেছেন, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো কারণে বাঁধটি ভেঙে গেলে শিলচর শহরসহ আশপাশের সব জনপদ ৯.৮ থেকে ৩২.৮ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে শহরটির দূরত্ব মাত্র সাড়ে ২৮ মাইল। ৫০ কিলোমিটার বেগেও যদি পানি নেমে আসে তবে বাঁধ ভাঙার এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে পানি পৌঁছে যাবে সিলেটের জকিগঞ্জে। দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সুরমা ও কুশিয়ারার পাড়ে শুরু হবে

মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। বড় বন্যার সময় ভূমিকম্প হলে টিপাইমুখে কী ঘটবে তা কল্পনাতীত।

আকবর আলি খানের মতে, টিপাইমুখ বাঁধের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, রয়েছে নিরাপত্তার সমস্যা। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি অগ্নিগর্ভ অঞ্চল। এখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। টিপাইমুখ বাঁধের মতো প্রকল্প স্থানীয় আদিবাসীদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। বিদ্রোহীদের ভয়ে ভারত সরকার বাংলাদেশি সংসদীয় প্রতিনিধিদের হেলিকপ্টার ছাড়া সড়কপথে বাঁধ এলাকায় নিতে সাহস পায়নি। এ ধরনের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অঞ্চলে টিপাইমুখের মতো বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো সময় ভারতবিরোধী সন্ত্রাসীরা এই বাঁধ উড়িয়ে দিতে পারে। এতে ক্ষতি ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের বেশি হবে। এই বাঁধের নিরাপত্তা তাই বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

ভারত বলে আসছিল, টিপাইমুখ বাঁধ ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের জন্য লাভজনক হবে। ভারত পাবে জলবিদ্যুৎ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য উৎপাদন ও পর্যটনের সুফল। অন্যদিকে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ কমবে আর শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ বাড়বে। এ রকম সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শকেরা ১৯৯৪ সালে সমর্থন করেছিলেন। অবশ্য এটি ছিল একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন। আকবর আলি খানের মতে, 'গত ১৫ বছরে টিপাইমুখ প্রকল্পের পরিবর্তন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নদীগুলোর প্রবাহে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই ১৯৯৪ সালের এ প্রতিবেদন এখন অপ্রাসঙ্গিক। তবে সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব যে এ ধরনের প্রকল্পে বাংলাদেশ উপকৃত হবে না।'

ইউএসএআইডির এক সমীক্ষায় অভিমত প্রকাশ করা হয়, দুটি কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতে জলাধার নির্মাণ করে বাংলাদেশে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ কমানো যাবে না। প্রথমত, বাংলাদেশে বন্যা কমানোর জন্য এ ধরনের জলাধারে বিপুল পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশে এক মিটার বন্যা কমানোর জন্য ৬৬ বিলিয়ন কিউসিক পানি জমাতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দূরে জলাধারে পানি রাখলে তার প্রভাব বাংলাদেশের বন্যার ওপর পড়বে না। বাঁধের নিচে যেসব ভারতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, সেসব অঞ্চলের পানি গড়িয়ে এসে বর্ষাকালে বাংলাদেশে পানির সরবরাহ বাড়িয়ে দেবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শকদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, শীতকালে টিপাইমুখ বাঁধের দুটি প্রভাব দেখা দেবে। প্রথমত, নদীর পানির উচ্চতা ১.৫ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এপ্রিল-জুন সময়ে

নদীর পানি উঁচু থাকলে যদি বৃষ্টির ফলে আকস্মিক বন্যা হয়, তবে ফসল রক্ষার জন্য যেসব নিমজ্জনক্ষম বা ডুবো (submersible) বাঁধ নির্মাণ করা হয় সেগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে। এসব বাঁধ উচু করতে হবে। তাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে কি না তাও পরীক্ষা করতে হবে।

ড. আকবর আলি খানের নিবন্ধে বলা হয়েছে, টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে জলাধার থেকে নিসৃত বরাক নদীর পানিতে দুটি পরিবর্তন দেখা দেবে। প্রথমত, বাঁধ থেকে নিসৃত পানি হবে উষ্ণ। গরম পানিতে মাছের ডিম মরে যাবে। বরাক নদীতে মাছের প্রজননক্ষেত্র হবে বিপন্ন। উপরন্তু যেসব মাছ বাঁধের উজান থেকে ভাটিতে যায় অথবা ভাটি থেকে উজানে যায় সেসব মাছের চলাচলের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হবে। এর ফলে অনেক প্রজাতির মাছ হারিয়ে যাবে। বিশেষ করে মহাশির মাছ, যা পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অবশ্য মাছের চলাচলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (fish ladder) এ প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ ধরনের ব্যবস্থা কোথাও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেনি। দ্বিতীয়ত, জলাধার থেকে টারবাইনের ভেতর দিয়ে যে জল আসবে তা হবে পলিমুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পলির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে বছরে ২.৪ বিলিয়ন টন পলি আসে। অর্থাৎ বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে বিশ্বের ১৮.৫ শতাংশ পলি পরিবাহিত হয়। অথচ বাংলাদেশের আয়তন পৃথিবীর ভূখণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম। চীনের কিছু অঞ্চল ছাড়া কোথাও নদীতে পলির পরিমাণ এত বেশি নয়। পলির আধিক্যের ফলে উজানে নির্মিত জলাধারগুলো অতিদ্রুত পলিতে ভরে অকার্যকর হয়ে যায়।

আকবর আলি খানের মতে, বরাক নদীতে পলির পরিমাণ হ্রাসের প্রভাব দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী। পলিশূন্য পানির তাৎক্ষণিক প্রভাবে বাঁধের নিচে পানির স্রোত তীব্রতর হবে এবং নদীর খাদে জমে থাকা বালি ভেসে যাবে এবং বাঁধের নিচে নদীর পাড় ভাঙতে থাকবে। এ ধরনের ভাঙন যদি ভারতের ভেতরে বেশি হয় তবে টিপাইমুখ বাঁধের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের ভেতরে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে চর পড়ে পানির প্রবাহ কমে যাবে। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চলে কম পানি আসবে। দ্বিতীয় একটি আশঙ্কা হলো, নদীভাঙন শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলাদেশের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশের ভেতরে মেঘনা অঞ্চলে চর পড়বে। এর ফলে বাংলাদেশের নদীতে ড্রেজিংয়ের ব্যয় বাড়বে এবং পানির জোগান কমে যেতে পারে।

যদি নদীতে পলি কমে যায়, তবে হাওড়গুলো নিচের দিকে নামতে থাকবে।

ফলে হাওড় অঞ্চলে জলাবদ্ধতা বেড়ে যেতে পারে। সারা দেশে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃতি কীভাবে এ ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেবে, বিস্তারিত গবেষণা ছাড়া সে সম্পর্কে সুষ্ঠু আলোকপাত সম্ভব নয়। হয়তো দীর্ঘমেয়াদে এটিই হবে বাংলাদেশের জন্য টিপাইমুখ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

তবে আশার কথা, এ প্রকল্পের বিষয়ে ভারতের নীতিনির্ধারকদের মনোভাবে ইদানীং কিছুটা পরিবর্তন টের পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রকল্পের কারণে নিজেদের ঝুঁকি ছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিকে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীসহ দায়িত্বশীলরা প্রকাশ্যে বলেছেন, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু তারা করবেন না। টিপাইমুখ প্রকল্পের বিকল্প হিসেবে তারা এখন ছোট ছোট জলাধার নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। ঢাকায় ২০১০ সালের ৪-৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বৈঠকে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন বিষয়েও বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় কর্মকর্তাদের ইতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এর আগে ২০০৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কোপেনহেগেন থেকে ফিরেই দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ ডেস্কের কর্মকর্তাদের ডেকে কথা বলেন। কর্মকর্তাদের তিনি জানিয়ে দেন, দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ঢাকার সঙ্গে যে সুসম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের সময় নিরাপত্তা ইস্যু ছাড়া অন্য চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে একেবারেই জোরাজুরি করা হবে না। শেখ হাসিনা চারদিনের সরকারি সফরে ভারতে যান ২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি। পরদিন নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে তার বৈঠক হয়। বৈঠকের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে নৈশভোজেও যোগ দেন শেখ হাসিনা। ১২ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয় দুদেশের যৌথ ঘোষণা। তাতেও টিপাইমুখ প্রকল্প প্রসঙ্গে বলা হয়, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু ভারত করবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন মনমোহন। ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম জানায়, হায়দরাবাদ হাউসে নৈশভোজের সময় মনমোহন সিং নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেন যে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের সব কার্যক্রম তারা বন্ধ করে দেবেন। ওই সময় পাশে থাকা প্রধানমন্ত্রীর দুই সফরসঙ্গী এ কথা শুনতে পান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারাই এ তথ্য জানান সংবাদমাধ্যমটিকে।

বিপন্ন পরিবেশ : দায়ী কে

পৃথিবীর 'ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়'। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে ওই দানবের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন, 'গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;/ অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।' পরযুগে দেবতা এসে দানবদমনের মন্ত্র পড়ায় 'নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,/ তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।' শুধু তা-ই নয়, এ যুগের দানব আরো অনেক শক্তিশালী। একশ্রেণীর মানুষই এখন দানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ। গদা-মুষলের বদলে তার হাতে এখন পরমাণু অস্ত্রসহ হরেক রকমের ভয়ানক মারণাস্ত্র। তার সর্বগ্রাসী মুনাফা লিপ্সা আর ভোগের বলি এখন গোটা বিশ্বের প্রকৃতি ও পরিবেশ।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় গত কয়েক দশক ধরেই সবস্তরের মানুষের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে আছে। কেননা পরিবেশ দূষণ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তা বিশ্বের জলবায়ুকেই বদলে দিতে শুরু করেছে। কার্বনসহ অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হিমবাহের গলন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। এতে দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানি ও রোগ-ব্যাধি। এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনাও চোখে পড়ে। যদিও এসব উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। একটি প্রশ্ন স্বভাবতই সামনে আসে, তা হলো– কে বা কারা কীভাবে বিশ্বকে এ বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো মহল থেকে পরিবেশ দূষণে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অসচেতনতার প্রভাবকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। পরিবেশ দূষণে এ তিনটি বিষয়ের ভূমিকাকে আড়াল করার অবশ্য অবকাশ নেই। তবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অসচেতনতাই পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ কি না সে প্রশ্ন উত্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। শুধু তা-ই নয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনা কিংবা কোনো কোনো 'গবেষণা' প্রতিবেদনেও যখন পরিবেশ দূষণে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অসচেতনতার প্রভাব নিয়েই শোরগোল তোলা হয়, তখন সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক যে, এটা পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ ও আসল অপরাধীদের আড়াল করার অপপ্রয়াস কি না।

স্টকহোমে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার ভাষণে দারিদ্র্যকেই পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগণ জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানোর মতো দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতি করছে। ওই সম্মেলনের প্রায় তিন দশক পর মরুকরণ প্রতিরোধ বিষয়ে ব্রাজিলে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (IFAD) সভাপতি ফাওজি আল-সুলতান বলেন, বিশ্বব্যাপী মরুকরণ এবং শুকনো ভূমির উর্বরতা কমার ওপর দারিদ্র্য বাড়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তার মতে, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে মরুকরণ হচ্ছে। মানুষের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে অতিরিক্ত চাষাবাদ, বনাঞ্চল উজাড় ও সেচের অব্যবস্থা ইত্যাদি। তিনি বলেন, বেশিরভাগ গরিব লোক গ্রামে বাস করে আর মরুকরণ ও জমির উর্বরতা হ্রাস এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এসব কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। তবে তা একপেশে বা খণ্ডিত সত্য। আর খণ্ডিত সত্য অনেক সময়ই মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে।

দারিদ্র্যই যদি পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল বা বড় কারণ হয়ে থাকে তাহলে জানা দরকার, দারিদ্র্য বাড়ারই বা কারণ কি? কে বা কারা এর জন্য দায়ী? সবারই জানা যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে দু-একটি ছাড়া অন্যরা নিজেদের উন্নয়ন নীতিমালা নিজেরা প্রণয়ন করে না। বিশ্বব্যাঙ্কসহ ঋণদানকারী সংস্থাগুলোই এ-সংক্রান্ত নীতিমালা ওইসব দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক তার ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন রিপোর্টে স্বীকার করেছে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও রোগ-ব্যাধি নির্মূলের লক্ষে পূর্ববর্তী ৫০ বছরে তাদের অনেক পরিকল্পনাই ছিল ভুল। ওই রিপোর্টে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলা হয়, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে বাঁধ নির্মাণের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্ক। কিন্তু যেখানে সেখানে বাঁধ নির্মাণের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি, স্থানীয় লোকজনকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের ফলে সামাজিক ক্ষতিসাধন এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এটুকু ব্যর্থতার স্বীকৃতি মিললেও মহাপাপের স্বীকারোক্তি বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে আশা করা যায় না। শুধু তা-ই নয়, কিছু ভুল-ত্রুটির কথা প্রকাশ করে ফেলায় বিশ্বব্যাঙ্কের ওই সময়ের প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজও আর টিকতে পারেননি প্রতিষ্ঠানটিতে। অচিরেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। পূর্ব ইউরোপে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর থেকে উন্নত দেশগুলো বিশ্বায়ন ও বাণিজ্য উদারীকরণের দোহাই দিয়ে তাদের শিল্পপণ্য ও পুঁজির জন্য উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বাজার উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য করলেও নিজেদের বাজার অন্যদের জন্য এতটুকুও খুলে দিচ্ছে না। আর এ কারণেই যে

এ সময়ে দেশে দেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়েছে এবং বাড়ছে সে সত্য আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উদার বাণিজ্য নীতি ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোকের ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে এ সত্যের জোরালো প্রকাশ ঘটে। এরপর থেকেই দেশে দেশে এ ধরনের বিক্ষোভ চলছে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাঙ্ককে জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রধান হুয়ান সুমাভিও তথাকথিত উদার বাণিজ্য ব্যবস্থাকে 'ক্যাসিনো অর্থনীতি' আখ্যা দিয়ে বলেন, বিশ্বায়নের সুফল অধিকাংশ মানুষই পাচ্ছে না; কারণ বিশ্বায়ন ক্যাসিনো বা পুঁজি-স্থানান্তর অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। ফলে বড় অঙ্কের পুঁজির স্থানান্তর ঘটেছে। এটা শ্রম-বাজারে সৃষ্টি করেছে অস্থিতিশীলতা। তার মতে, মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের (UNIC) মাসিক নিউজ বুলেটিন 'জাতিসংঘ সংবাদ'-এর জুন-জুলাই ২০০০ সংখ্যার মূল প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিশ্বায়ন নিয়ে ভয়ভীতি ১৯৯৫ সালে সামাজিক শীর্ষসম্মেলন আয়োজনে বড় ধরনের গতি সঞ্চার করে। শীর্ষসম্মেলনের পর বস্তুতপক্ষে প্রায় সকল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট বিশ্বায়নের নিরন্তর ত্বরান্বিত গতিধারাকে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে।'

এ-তো গেল বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার তথা বাণিজ্য উদারীকরণের নামে দারিদ্র্য ও বৈষম্য সৃষ্টিতে উন্নত দেশগুলোর ভূমিকার কথা। এবার নজর দেওয়া যাক সরাসরি পরিবেশ বিপর্যয়ে এদের ভূমিকার প্রতি। পরিবেশবাদী সংগঠন ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (ডাব্লিউডাব্লিউএফ) ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে এই বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে যে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) মুক্তবাজার অভিমুখী নয়া উদারীকরণ চেষ্টা পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের প্রতি হুমকিস্বরূপ। সংস্থার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ইউনিটের প্রধান চার্লস আর্দেন ক্লার্ক বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আইনে বাণিজ্য সংক্রান্ত ধারাগুলো বহাল থাকলে তা বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য মূলত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ক্রমাগত বেড়ে চলাকেই দায়ী করা হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন বাড়ার জন্য আবার দায়ী করা হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্বজুড়ে মানুষের সংখ্যা বাড়ার ফলে বনের পরিমাণ কমছে; বাড়ছে নানারকম জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; তাতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ বাড়ছে; অন্যদিকে

পৃথিবীতে খনিজ জ্বালানির ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। দুইশ' বছর আগে অর্থাৎ ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল ০.২৮০ শতাংশ; ১৯৭২ সালে তা বেড়ে হয় ০.৩২৭ শতাংশ; আর ১৯৯৫ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ০.৩৬০ শতাংশ। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। এর প্রভাবে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও। এ কারণে বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের ১৭ শতাংশ এলাকা নিকট ভবিষ্যতে পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমণজনিত ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের দায় বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের ওপর চাপানো হলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন কথাই বলে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) ১৯৯৮ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউইয়র্ক, প্যারিস অথবা লন্ডনে আজ যে শিশু জন্ম নিচ্ছে সে যে-পরিমাণ পণ্য ও সেবা ভোগ করবে এবং বর্জ্য তৈরি বা পরিবেশ দূষণ করবে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ৫০টি শিশুর ভোগ ও দূষণের সমান। এতে আরো বলা হয়, উন্নত দেশগুলোর ৫ শতাংশ ধনী মানুষ বিশ্বের ৫৩ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইডজনিত বায়ু দূষণের জন্য দায়ী; আর দরিদ্রতম ৫ শতাংশ মানুষ দায়ী মাত্র ৩ শতাংশ দূষণের জন্য। ইউনেস্কো ও বিশ্বব্যাঙ্কের ১৯৯৭ সালের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড দূষণের পরিমাণ ছিল ২০.৫ মেট্রিক টন। অথচ এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি জনসংখ্যার দেশ চীনে ওই বছর মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড দূষণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২.৭ টন; যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ সবচেয়ে বেশি হয় ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকোতে। এরপরও কি পরিবেশ বিপর্যয়ের দায় দরিদ্র মানুষদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব?

অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণের মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলোই যে মূলত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী সে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জাপানের কিয়োটোতে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলনে। ওই সম্মেলনে শিল্পোন্নত ৩৭টি দেশকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে একটি চুক্তিও হয়, যা কিয়োটো প্রটোকল নামে পরিচিত। সম্মেলনে ১৬০টি দেশ যোগ দেয়। সব দেশই কিয়োটো প্রটোকলে সই করে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাতে সই করেন দেশটির তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর। কিন্তু পরে বুশ ক্ষমতাসীন হয়ে চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেন। ২০০৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১৮৭টি দেশ কিয়োটো প্রটোকলে সই ও অনুমোদন করলেও যুক্তরাষ্ট্র তা করেনি। সর্বশেষ কোপেনহেগেন সম্মেলনেও যুক্তরাষ্ট্রসহ সর্বাধিক দূষণ

সৃষ্টিকারী দেশগুলো একটি ছেলেভোলানো অঙ্গীকারনামা সই করে, যাতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণ কমানোর সুনির্দিষ্ট মাত্রা ও সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। সম্মেলনে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় দূষণকারী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবনহানির জন্য তারাই দায়ী। এ এক ধরনের গণহত্যা।'

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারতসহ ২৮টি দেশ চুক্তির যে খসড়া তৈরি করে তাকে 'ত্রুটিপূর্ণ' বলে অভিহিত করেন দরিদ্র দেশগুলোর গ্রুপ জি-৭৭ এর চেয়ারম্যান লুমুম্বা ডি আপিং। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একটি সমঝোতার কথা ঘোষণা করার কয়েক ঘন্টা পর বাংলাদেশ সময় শনিবার (২০০৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর) ভোর সোয়া ছয়টার দিকে কোপেনহেগেনে এক সংবাদ সম্মেলনে লুমুম্বা বলেন, 'আজ চরম লংঘনের ঘটনা ঘটল, যা গরিবদের বিরুদ্ধে, স্বচ্ছতার ঐতিহ্যের পরিপন্থী। সুদান কখনো এমন কোনো চুক্তিতে সই করবে না যা আফ্রিকাকে ধ্বংস করে দেবে। এই চুক্তি গরিব দেশগুলোকে আরো খারাপ পরিস্থিতিতে ফেলবে।' তিনি আরও বলেন, 'চুক্তির খসড়াটি আস্বাভাবিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। আজ কী ঘটছে? আমরা সন্দেহ করে আসছিলাম যে ডেনিশ সরকার এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র একটি চুক্তি চাপিয়ে দেবে। বাস্তবে তা-ই হয়েছে। এটা জাতিসংঘের ঐতিহ্যের চরম লংঘন। চুক্তি কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কোনো নির্দেশনামূলক কাঠামো, গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। কারণ ২৮টি দেশ বাকিদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

চুক্তির খসড়ার ত্রুটি সম্পর্কে জি-৭৭ চেয়ারম্যান বলেন, প্রথম ত্রুটি হলো গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার বিষয়টি। এটা করা হলে আফ্রিকা এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। এই খসড়ায় গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর লক্ষ্যমাত্রা খুব উচ্চাভিলাষী নয়, নিচু পর্যায়ের। এই খসড়া চুক্তি গরিব দেশগুলোকে চিরকালের জন্য দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন সাংবাদিকদের বলেন, 'অবশেষে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি।' তিনি অবশ্য এটাও বলেন, 'আগামী বছর অবশ্যই চুক্তিটিকে আইনি বাধ্যবাধকতার রূপ দিতে হবে।' জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, "এই 'কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড' হয়তো সবাই যা চেয়েছিলেন তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন নয়; তবে এ সিদ্ধান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনা।"

সম্মেলনের ফল যে খুব একটা আশাব্যঞ্জক হয়নি তার স্বীকৃতি মেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কথায়ও। সম্মেলন শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর

২০০৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর পিবিএস নিউজআওয়ারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওবামা বলেন, 'কোপেনহেগেনের জলবায়ু সম্মেলনের ফলাফলে লোকজনের হতাশা প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত বলেই আমার মনে হচ্ছে।' তিনি অবশ্য সম্মেলনকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলতে রাজি নন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যা বলছি তা হচ্ছে, কোপেনহেগেন আলোচনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, সেখান থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি—এভাবে দেখলে তা হবে বড়ধরনের পশ্চাৎমুখী মনোভাব। আর কিছু না হোক, আমরা অবস্থান থেকে খুব একট পিছিয়ে পড়িনি এবং পরবর্তী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।'

কার্বন নির্গমণ কমানোর প্রশ্নে এ সম্মেলনে পুরোনো ধনী আর দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসরমান দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট হয়েছে। চীনের মতো বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো বলছে, উন্নত দেশগুলো বহুবছর ধরে পরিবেশ দূষণ করে আসছে নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে। এখন অন্যদের শিল্পায়নের পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সম্মেলনে ওবামার মধ্যস্থতায় শেষপর্যন্ত যে চুক্তি হয় তাকে পরিবেশের জন্য এক 'বিপর্যয়' আখ্যা দিয়েছে সুইডেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন সম্মেলনকে দেখেছেন মোটের ওপর ব্যর্থ ও নৈরাজ্যকর হিসেবে। ব্রিটিশ পরিবেশমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড গার্ডিয়ান পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছেন, সম্মেলনে চুক্তির প্রচেষ্টাকে চীন 'হাইজ্যাক' করেছে। চীন এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, ব্রিটেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

ওবামা কারো দিকে আঙ্গুল নির্দেশ না করলেও বলেছেন, সম্মেলনে তার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের আগেই চীন আলোচনা এড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, 'একপর্যায়ে আলোচনা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছিলেন, চীনা প্রতিনিধিরা আলোচনা এড়িয়ে চলছিলেন, অন্যরা সবাই হইচই জুড়ে দিয়েছিল, তখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কী করার ছিল।' তিনি আরো বলেন, 'আইন করে না হলেও কার্বন নিগর্মনের বিষয়ে আমরা একটা মতৈক্যে পৌঁছাতে পেরেছি। এটা শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের জন্য নয়, চীন ও ভারতের জন্য কার্বন নির্গমনের একটা মাত্রা ঠিক করতে পেরেছি।'

জার্মান সাংবাদিক মার্কাস বেকার একটি ওয়েবসাইটে এক নিবন্ধে লিখেন, সম্মেলন শেষ হওয়ার কিছু সময় আগে মনে হচ্ছিল, এ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়া হয়তো ঠেকানো যাবে। চূড়ান্ত ঘোষণার শেষ দিককার খসড়াগুলোতে ২০৫০ সাল নাগাদ শিল্পায়নপূর্ব স্তরের থেকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ করার পাশাপাশি কীভাবে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে, তার

বিধানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০৫০ সাল নাগাদ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৮০ শতাংশ কমানো এবং ২০২০ সাল নাগাদ মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যের সম্ভাবনার উল্লেখও এতে ছিল। অবশেষে যে ছোট খসড়া চুক্তিতে ৩০টি শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্র সম্মত হয়, তাতে কেবল দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের বিধান রাখা হয়। আগামী দশকগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার উল্লেখ তাতে আর থাকেনি। জলবায়ু বিপর্যয় রোধে বিজ্ঞানীরা যে হারে নিঃসরণ কমানোর কথা বলেছেন, সে বিষয়ে অঙ্গীকারে আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি রাখা হয়নি। কোপেনহেগেনে যে চরম ব্যর্থতা দেখা গেছে, তাতে হয়তো দুই ডিগ্রির সীমাও মেনে চলা হবে না। ৩০টি দেশের গ্রুপ আপসের এ পরিকল্পনা মূল হলে উপস্থাপন করলে ১৯২টি দেশের বাকি দেশগুলোর অনেকে প্রায় তৎক্ষণাত তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের পক্ষে এটাকে কোনো সমাধান হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বলা দরকার, সেটি হচ্ছে–বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো ভোগবাদ। বিশ্বায়নের আসল সুবিধাভোগী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই মূলত তাদের মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থে মানুষের মধ্যে এই ভোগবাদী প্রবণতাকে উস্কে দিচ্ছে। এ কাজে তারা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচারসহ রকমারি কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে ব্যাপক বৈষম্য। ইউএনডিপির রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নত বিশ্বের একটি শিশু তার সারা জীবনে উন্নয়নশীল বিশ্বের ৩০-৩৫টি শিশুর চেয়ে বেশি পরিমাণ ভোগ করে এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক খবরে বলা হয়, ওই বছর মার্চ মাসে জাপানে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে যায়। উল্লেখ্য, জাপান বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনকারী দেশ। ১৯৫০ সাল থেকেই উন্নত দেশগুলো তাদের অধিক আয় ও ভোগের কারণে বিশ্বের মোট সম্পদের অর্ধেকেরও বেশি ব্যবহার করে চলেছে।

ওয়ার্ল্ডওয়াচ ইনস্টিটিউট নামে একটি সংস্থা বিশ্বের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রবণতা নিয়ে ২০০১ সালের জুন মাসে এক রিপোর্টে জানায়, ভোক্তাদের অপূরণীয় চাহিদা পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ক্রমাগত প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে। উন্নত বিশ্বের ভোক্তারা যে ধরনের জীবনযাত্রা পছন্দ করে তা বিশ্বের জন্য মোটেই মানানসই নয়। পরিবেশ বিজ্ঞানী মিখাইল রেনারের মতে, বিশ্বের বেশিরভাগ লোকেরই উন্নত দেশের ভোক্তাদের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সামর্থ্য না থাকলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমবিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনও ওইরকম জীবনযাত্রা অনুসরণের চেষ্টা করে। ওয়ার্ল্ডওয়াচের 'ভাইটাল সায়েন্স ২০০১' শিরোনামের রিপোর্টে মানুষের ৪৯টি আলাদা প্রবণতার

কথা উল্লেখ করা হয়। এসব প্রবণতার মধ্যে আছে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দূষণ সৃষ্টিকারী পলিভিনাইল ক্লোরাইডের ব্যবহার বৃদ্ধি, বেশি বেশি মাংস খাওয়ার প্রবণতা, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ইত্যাদি। রিপোর্টে বলা হয়, মানুষের এই ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছে। এমনকি ভেঙে পড়ছে প্রতিবেশগত (eco-logical) জটিল নিরাপত্তা বেষ্টনি।

এ কথা ঠিক যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বন উজাড় হচ্ছে বেশি। গত দুই দশকে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দেশগুলোতে ৭০ লাখ হেক্টরের মতো জমির গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চলে এ সময়ে বন নিঃশেষ হয়েছে ৪০ লাখ হেক্টর জমির। এর বেশিরভাগই শেষ হয়েছে কাঠ ও কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে। ১৯৫০ সালের তুলনায় এ দুটি উপকরণের চাহিদা বেড়েছে যথাক্রমে দ্বিগুণ ও পাঁচগুণ। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ওই কাঠের অর্ধেকেরও বেশি এবং কাগজের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে উন্নত দেশগুলোতে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও দেখা যায়, বন উজাড়ের জন্য দরিদ্র মানুষের চেয়ে স্থানীয় বিত্তবানরাই বেশি দায়ী। সাধারণ মানুষ হয়তো জীবিকার তাগিদে কিছু ডাল-পালা কিংবা গাছ সংগ্রহ করে; কিন্তু বিত্তবানরা নিজেদের ভোগবিলাসের প্রয়োজন ছাড়াও অবৈধ মুনাফা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বিস্তীর্ন বনাঞ্চল উজাড় করে ফেলে। ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ দৈনিক প্রথম আলোর প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল '৩ পার্বত্য জেলা বর্ণহীন হয়ে পড়েছে : চট্টগ্রামের জিওসি/ কাঠ পাচারে রাজনৈতিক নেতা সরকারি কর্তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ'। খবরে বলা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ধ্বংস ও কাঠ পাচারের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যোগসাজশের অভিযোগ এনেছেন সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুল কবীর। তিনি অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে কারো নাম প্রকাশ করেননি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে লেখা চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন উজাড়ের আতঙ্কিত হওয়ার মতো ভয়াবহ এক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়, গত ডিসেম্বর মাসে কেবল রাঙ্গামাটি অঞ্চলে জোত পারমিটের (বনজ সম্পদ আহরণের সরকারি অনুমতিপত্র) আওতায় অনুমোদিত কাঠের চেয়ে কেবল সড়ক পথেই ৯ গুণ বেশি কাঠ পাচার হচ্ছে।' একটি বিদেশি ইমেজ প্রেসের সংবাদদাতা ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ কোয়ালিশনের প্রোটেক্টর তারেকুল ইসলাম মুন্না ২০০১ সালের ৪ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক-এ 'সুন্দরবনকে গ্রাস করছে কারা?' শীর্ষক এক নিবন্ধে

উল্লেখ করেন, 'বনচোর' বা 'বৃক্ষ চোর'রা এত শক্তিশালী যে, তাদের চুরি ধরার পরও আইনে কিছু হয় না। এরা জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তদন্তে বাধা সৃষ্টি করতেও সাহসী হয় অদৃশ্য সুতার টানে।

উল্লেখ্য, সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহৎ বনাঞ্চল; যে কারণে ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য বিষয়ক কমিটির ২১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের সুন্দরবনের অংশবিশেষকে বিশ্ব ঐতিহ্যের (World Heritage) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ৭টি উপজেলার ৫ লাখ ৭৭ হাজার ২৮৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে এ সুন্দরবন। এর মধ্যে ৪ লাখ ১ হাজার ৬০০ হেক্টর বনাঞ্চল এবং বাকি ১ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮৫ হেক্টর নদ-নদী ও খাল। মূল্যবান সুন্দরী গাছ এই বনাঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ হলেও এখানে আরো রয়েছে গেওয়া, কেওড়া, গরান প্রভৃতি নানা প্রজাতির গাছ। কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং প্রভাবশালী বিত্তবানদের মুনাফা লিপ্সার কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলটি বিপন্ন হওয়ার মুখে। ২০০২ সালের ১৭ মার্চ দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সুন্দরবনের সম্পদ লুটপাট ও বন ধ্বংসের প্রক্রিয়ার সঙ্গে একশ্রেণীর অসৎ বন কর্মকর্তা-কর্মচারি, রাজনৈতিক গডফাদার ও পুলিশ জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সংরক্ষিত বন হিসেবে সুন্দরবন থেকে গাছ কাটা নিষিদ্ধ। তবে রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে গরান কাঠ, গোলপাতা, মধু প্রভৃতি আহরণব্যবস্থা চালু আছে। এসব সম্পদ আহরণে সরকারি রাজস্বের কয়েকগুণ বেশি অর্থ আদায় করা হয়। এ কারণে বাওয়ালীরা ইচ্ছামতো গরান ও গোলপাতা নেয়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বৈধতার আড়ালে যেমন সুন্দরবনের সম্পদ লোপাট হচ্ছে তেমনি চোরাকারবারিরা সুন্দরবন থেকে দেদার সুন্দরী, পশুরসহ মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর অসাধু বন কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন থানা পুলিশের সহযোগিতা এবং শহরের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গডফাদারের পৃষ্ঠপোষকতায় সুন্দরবন বিরান হতে চলেছে।

দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল মধুপুর। এখানে মোট বনভূমির পরিমাণ ৪৫ হাজার ৫৬৫ দশমিক ১৮ একর। সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ এখানকার সরকারি বনভূমির দুই-তৃতীয়াংশই এরইমধ্যে বেদখল হয়ে গেছে বলে খবর বেরিয়েছে। অবৈধভাবে দখল করা এ বনভূমির গাছ কেটে বন উজাড় করে সেখানে তৈরি করা হচ্ছে কৃষিজমি বা ঘরবাড়ি। শুধু তা-ই নয়, জবর-দখল করা বনভূমি বেচা-কেনাও হচ্ছে অবাধে। আর এসবই করছে সমাজের বিত্তবানরা। ২০০২ সালের ২৪ এপ্রিল দৈনিক সংবাদ-এ এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ

মধুপুরের সরকারি বনভূমি জবর-দখলের হিড়িক চলছেই। এরইমধ্যে এ বনাঞ্চলের ৩০ হাজার একরেরও বেশি বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে। বনভূমি বেদখল প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। সরকারি দলের ক্যাডার এবং বন এলাকার প্রভাবশালীরাই মূলত বনভূমি জবর-দখল করছে।

নজর দেওয়া যাক ধনী দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আরো কিছু কাজ-কারবারের দিকে। আর্থিক সামর্থ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সুবাদে ধনী দেশগুলো দূষণরোধী নানা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। এর মাধ্যমে নিজেদের দেশে পরিবেশ উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। ওইসব দেশের ভেতরে দূষণবিরোধী আন্দোলন ও সচেতনতার কারণে সব ধরনের পণ্যের গায়ে 'পরিবেশগতভাবে নিরাপদ' লেবেলও লাগাতে হচ্ছে; অন্যদিকে দূষণের জন্য দায়ী শিল্প-কারখানাগুলো পাচার করা হচ্ছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। ধনী দেশগুলো দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির শীর্ষে পৌঁছাতে গিয়ে বহু দশক ধরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে আসছে প্রাকৃতিক সম্পদ। সেইসঙ্গে ওইসব দেশে কার্বন নির্গমন বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত হারে। এ অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ার প্রধান কারণ। এছাড়া উন্নত দেশগুলো তাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান দিতে বাধ্য করে আসছে অনুন্নত দেশগুলোকে। এভাবে বিশ্বের প্রকৃতি ও পরিবেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো। অঢেল অর্থ ও উন্নত প্রযুক্তির সুবাদে তারা নিজেদের পরিবেশ রক্ষায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মনোযোগী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প-কারখানাগুলো সরিয়ে দিতে শুরু করেছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে। মার্কিনীরা নিজ দেশে বর্জ্য পদার্থ পোড়ানোর জন্য দহন-চুল্লি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে তা। এছাড়া কার্বন নির্গমন কমাতেও তেমন উদ্যোগ নিচ্ছে না শক্তিধর ওইসব দেশ। ফলে সার্বিকভাবে পরিবেশ রক্ষা কথার কথাই থেকে যাচ্ছে।

এদিকে পরিবেশ নিয়েও এখন শুরু হয়েছে বাণিজ্য। কেননা পরিবেশ নিজেই এখন এক গুরুত্বপূর্ন শিল্প। সমরাস্ত্র, গাড়ি, রাসায়নিক ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পের মতোই 'পরিবেশ-শিল্প' বর্তমানে প্রতিষ্ঠিতই শুধু নয়, ধনী দেশগুলোর মধ্যে শিল্পভিত্তিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয়ও। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে মূলত তিনটি ক্ষেত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে এ পরিবেশ-শিল্প। এগুলো হলো—কল-কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দূষণরোধী প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করা; ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (সিএফসি), কীটনাশক, সীসাযুক্ত পেট্রোল ইত্যাদির মতো যেসব বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশকে দূষণ করে অথচ যা

ব্যবহার না করলেই নয় সেইসব রাসায়নিক পদার্থের বিকল্প প্রস্তুত করা; শিল্প-কারখানার নির্গত বর্জ্য পদার্থ, বায়ু-দূষক ও জল-দূষক পদার্থের পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা।

পরিবেশগত কারণেই অভ্যন্তরীণ বাজার দখলের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প-বাণিজ্য। শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যেও বাজার দখলের লড়াইয়ে প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে পরিবেশ। জাপানের উৎপাদিত মোটর গাড়ির বায়ু-দূষকের নির্ধারিত মাত্রা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কমই শুধু নয়, প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও জাপানি গাড়ি অনেক উন্নতমানের। জাপানি গাড়ির আমদানি কমানোর লক্ষ্যে মার্কিনীরা তাদের দেশের গাড়ির নির্ধারিত দূষক মাত্রা জাপানের চেয়ে অনেক শিথিল রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দেশে জাপানি গাড়ির আমদানি কমানো যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি গাড়িগুলো অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি করতে না পারলেও যেসব দেশে বায়ু-দূষকের নির্ধারিত মাত্রা শিথিল সেইসব দেশে রপ্তানির চেষ্টা করা হয়। এভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ব্যবসাও পরিবেশের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

সারাবিশ্বের বাজার নিজেদের কব্জায় রাখতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশে তাদের শিল্প ইউনিটগুলো চালায়। যদি কোনো দেশে পরিবেশগত কারণে তাদের কারখানা গুটিয়ে ফেলতে হয় কিংবা দূষণবিরোধী প্রযুক্তি ব্যবহারের দরুন উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়, তবে পরিবেশগত বিধিনিষেধ যেখানে শিথিল সেখানে ওই কারখানা স্থানান্তর করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, দূষণরোধী প্রযুক্তি ব্যবহারের চেয়ে কারখানা স্থানান্তর করা ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক। আর মুনাফাটাই এদের কাছে মুখ্য। কখনো কখনো দেখা যায়, কোনো শিল্প-কারখানা থেকে উৎপাদিত পণ্যটি পরিবেশগতভাবে নিরাপদ হলেও ওই পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতিটি পরিবেশকে দূষিত করে। উন্নত দেশগুলো বিশেষভাবে এধরনের শিল্প-কারখানা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে চালান করছে। আর এসব দেশের কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দেশে। উন্নত দেশগুলো তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হওয়ায় পরিবেশগত দিক দিয়েও এই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের দেশের যেসব পণ্য পরিবেশগতভাবে নিরাপদ নয় সেগুলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে রপ্তানিতে কোনো বাধা নেই। ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রক দেশগুলোর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের অপসারণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরিবেশ-শিল্পগুলোর বিরুদ্ধেও পরিবেশ দূষণের গুরুতর অভিযোগ উঠছে। এ নিয়ে জনপ্রতিরোধও গড়ে উঠছে বিভিন্ন স্থানে। বর্জ্য পদার্থ অপসারণের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ আছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্প থেকে নির্গত এসব বর্জ্য পদার্থ মূলত অনুন্নত দেশ ও তাদের আশেপাশের সাগরে বা পরিত্যক্ত জায়গায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্জ্য পদার্থ কাঁচামাল হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় পলিথিন ও ধাতু জাতীয় বর্জ্য পদার্থের কথা। উন্নত দেশগুলোতে এসব বর্জ্য পদার্থ বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য করে বাতিল করা হয়; আর কাঁচামাল হিসেবে বিক্রি করা হয় ভারত ও বাংলাদেশের মতো দেশে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পরিবেশ-বিধ্বংসী কাজকর্ম এতটাই উদ্বেগজনক যে জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটি বছর কয়েক আগে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'বহুজাতিক সংস্থা ও পরিবেশ রক্ষার সমস্যা' শীর্ষক এক আলোচনার আয়োজন করতে বাধ্য হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিষয়ে জাতিসংঘের যে গবেষণা কেন্দ্র আছে তার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের অন্তত এক-চতুর্থাংশ সম্পদ, বিশ্ব বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ পণ্য, মূলত রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত ফসলি জমির ৮০ শতাংশ এবং নতুন কৃৎকৌশলের বড় অংশ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই কমিটি মনে করে, এসব কোম্পানির কাজকর্মে টেকসই উন্নয়নের প্রতি নজর দিলেই কেবল বিশ্ব পরিবেশের উন্নয়ন সম্ভব।

পরিবেশ দূষণে তৃতীয় বিশ্বের অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের যে কোনো প্রভাব নেই তা নয়; বরং বলা যায়, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য মোকাবিলার উপযোগী বিকল্পের অভাবে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অভাবনীয় চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তাই বলে কি ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরি, সমুদ্রজলের দূষণ এবং বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের কেন্দ্রীভবনসহ দুনিয়াজোড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূল দায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব? আসলে এসবই যে ছেঁদো কথা তা স্পষ্ট হয়ে গেছে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী শীর্ষসম্মেলনে। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়, পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলো। তাদেরই শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ওজোনস্তরের ক্ষয় ঘটিয়েছে। তাদেরই বর্জ্য জঞ্জাল, তেল ইত্যাদি সমুদ্রের জলকে বিষিয়ে তুলেছে। শিল্পোন্নত দুনিয়ার বহুজাতিক কোম্পানিগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করে সম্পদ লুটের যে কারবার চালু রেখেছে তার জন্য তারাই হলো প্রধান আসামি। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের আগে লুট করা হতো মূলত পরাধীন দেশের সম্পদ। আর এখন এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়া চলছে নতুন কায়দায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে নয়া-উপনিবেশবাদ। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য পুনরুপনিবেশবাদী প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিমা দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান ভোগলিপ্সার রাহু এভাবেই গ্রাস করছে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগলোর সম্পদ।

রিও সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়েছিল, 'টেকসই বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন অর্জন করতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথতে হবে। আর টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হলো দারিদ্র্য দূর করা।'

১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে তৃতীয় দুনিয়ার মূল বক্তব্য ছিল রিও ঘোষণার এই শেষ কথাটিই। তৃতীয় বিশ্বের জনবিস্ফোরণ ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাই পরিবেশ দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী– স্টকহোমে উন্নত বিশ্বের প্রবক্তাদের এ দাবির জবাবে তৃতীয় বিশ্বের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন, দারিদ্র্যই যদি পরিবেশ দূষণের মূল কারণ হয়ে থাকে তাহলে দারিদ্র্য দূর করাই হবে প্রধান কর্তব্য। আর এখানে এসেই ধরা পড়ে যাচ্ছে উন্নত বিশ্বের সব চাতুরি। পরিস্থিতির চাপে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষে দফায় দফায় নানা প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেও সেসব রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে।

এক সময় পরিবেশ দূষণের জন্য দারিদ্র্যকে দায়ী করা হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের কথাবার্তা তেমন একটা শোনা যায়নি। গত বছর অবশ্য পশ্চিমা বিশ্বের একটি গবেষণায় দাওয়াই দেওয়া হয় এই বলে যে, বিশ্বের উষ্ণায়ন কমাতে হলে জনসংখ্যা কমাতে হবে। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির দায়টা পরোক্ষভাবে জনবহুল উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়। এ গবেষণাটি কার্যত মানুষের হাসির খোরাক জোগায়। পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে মূলত পশ্চিমা দুনিয়ার সীমাহীন ভোগ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারই দায়ী সে নিয়ে এখন আর কোনো মতভেদ নেই। সম্প্রতি অবশ্য এ তালিকায় যোগ হয়েছে চীন ও ভারতের মতো কয়েকটি উঠতি ধনী দেশ। পরিবেশের বারোটা বাজানো সত্ত্বেও ধনী দেশগুলো তাদের ভোগবাদী জীবনযাত্রা বদলাতে নারাজ। কার্বন নির্গমন কমানোর চেয়ে বরং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে কিছু সাহায্য দিতেই তারা বেশি আগ্রহী। অন্যদিকে উঠতি ধনী দেশগুলো বলছে, পুরোনো শিল্পোন্নত দেশগুলো বহু বছর ধরে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে উন্নতির চরমে পৌঁছেছে। কাজেই তাদের বেলায় আপত্তি কেন! এ গ্রহের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় হোক, তবু 'উন্নয়ন' তাদের চাই-ই চাই।

জীববৈচিত্র্য, বিশ্বায়ন এবং গরিব মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন

বায়োডাইভারসিটি বা জীববৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা প্রায় সব দেশেই বেড়েছে। কেননা পৃথিবীর বুকে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের অস্তিত্ব ভবিষ্যতে থাকবে কি থাকবে না তা অনেকখানি নির্ভর করছে জীববৈচিত্র্য রক্ষার ওপর। এ বিষয়ে গণসচেতনতা এখনো সৃষ্টি না হলেও বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট শঙ্কিত। রাজনীতিবিদ তথা রাষ্ট্রনায়করা এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা না রাখলেও মুখে মুখে কিছু কথা বলতে হচ্ছে তাদেরও।

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, যেমন–বায়ু, পানি, মাটি প্রভৃতির দূষণ জীবজগতের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করে দেয়। অপরদিকে জীবজগতের ভারসাম্য বজায় না থাকলে শুধু যে চারপাশের পরিবেশের রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট হয় তা-ই নয়, জলবায়ু-মাটি-পানির ভারসাম্যও বজায় থাকে না। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হলে যে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বা বাস্তুতান্ত্রিক (environmental and ecological) বিপদও ঘনিয়ে আসবে সে বিষয়ে পরিবেশ সচেতন মানুষের মধ্যে কমবেশি উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেলেও একটি বিষয়ে উদ্বেগ এখনো ততটা দেখা যায় না। আর সেটি হচ্ছে জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়ার দরুন গোটা দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এই বিশাল জনগোষ্ঠী দরিদ্র বলেই হয়তোবা তাদের এ আশু বিপদ নিয়ে কেউ তেমন একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না।

দুনিয়ার সব অঞ্চলের সব মানুষের জীবনই একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তার চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের হরেক রকম গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে। একেক দেশের একেক অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সঙ্গে খাপ খাইয়েই গড়ে উঠেছে সেসব দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা। জীববৈচিত্র্য তাই কেবল একটি সংরক্ষণমূলক ইস্যু নয়। মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন এবং পণ্য ভোগরীতির (consumption patterns) সঙ্গেও এটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের উৎপাদন ও জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। উৎসব-পার্বণ, কারুকাজ তো বটেই এমনকি খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি প্রভৃতির জন্যও এসব মানুষ জৈব উৎস থেকে পাওয়া সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এক

কথায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও ভোগরীতির ভিত্তিই হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। তাই জীবজগতের বৈচিত্র্য নষ্ট হলে পরিবেশগত বিপদ ঘনিয়ে আসবে, বিষয়টি শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ফলে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের রুটি-রুজির পথও বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের আর কোনো সুযোগ থাকবে না। কেননা জীববৈচিত্র্য-নির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমেই এই বিপুলসংখ্যক মানুষ এতকাল ধরে টিকে আছে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হলে ধনী জনগোষ্ঠীর পণ্য ভোগরীতি দরিদ্রদের ভোগরীতির ক্ষতি করতে পারে। আর বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে করছেও তা-ই।

কৃষিজ জীববৈচিত্র্য এবং গ্রামীণ জনগণের জীবন-জীবিকা

বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষেরই বাস তৃতীয় বিশ্বের গ্রামাঞ্চলে। আর তাদের জীবিকা ও ভোগের ভিত্তি হচ্ছে কৃষিজ জীববৈচিত্র্য, যার মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতিগুলো রয়েছে। ফসলের জাত (variety) বলি আর পশুর বংশ বা জাতই (breed) বলি, সবই উদ্ভূত হয়েছে মূলত নানা ধরনের বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেমের বৈচিত্র্যের প্রতিক্রিয়ার ফলে। ধান-বীজ বা জাতগুলোর উদ্ভব হয়েছে বন্যাকবলিত অঞ্চল ও বৃষ্টিবহুল পার্বত্য ঢালু এলাকায় জন্মানোর জন্য। অপরদিকে গবাদিপশুর জাতগুলোর উদ্ভব ঘটেছে মরুভূমি এবং বৃষ্টিবহুল ক্রান্তীয় বন (wet rainforest) এলাকার জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য। আর প্রকৃতির গুণাবলির সঙ্গে গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার ফলেই যেহেতু সংস্কৃতির উদ্ভব, জীববৈচিত্র্যও তাই মানুষের ভোগরীতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

জীবজগতের বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অত্যন্ত জটিল ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষকে তার বেঁচে থাকা এবং পুষ্টিসাধনের জন্য জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কি বন্য দশায়, কি গার্হস্থ্য জীবনযাপনের অবস্থায় (domesticated form), সব ক্ষেত্রে প্রকৃতির অসীম দান থেকেই মানুষ তার জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে নিয়েছে এবং জ্ঞানকে বিকশিত করেছে। শিকারি এবং ফল-মূল, লতা-পাতা সংগ্রহ করে জীবন ধারণকারী জনগোষ্ঠী তাদের খাদ্য, ওষুধ, আশ্রয় হিসেবে হাজার হাজার উদ্ভিদ ও পশু-পাখি ব্যবহার করে থাকে। মেষপালক বা অন্য কোনো পশু পালনকারী, কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে উঠেছে তারা যে-অঞ্চলে বাস করে সেখানকার ভূমি, নদী-নালা, খাল-বিল ও সমুদ্রের বৈচিত্র্য এবং সেগুলোর পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। মানুষ এবং তার চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে তাই এক মিথজৈবিক (symbiotic) সম্পর্ক বিদ্যমান। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যেমন তার চারপাশের জীবজগতের সাহায্যে নিজেদের

আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করেছে, তেমনি তারা ভূপৃষ্ঠের জীববৈচিত্র্যকেও করেছে সমৃদ্ধ।

কৃষি ও বনবিদ্যা (forestry)-সংক্রান্ত জ্ঞান ও তার প্রয়োগের মধ্যে এই মিথোজীবিতার সর্বোত্তম চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কোনো বনাঞ্চল থেকে কি উপায়ে কতটুকু খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায় এবং ওই বনাঞ্চল সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রাকে কীভাবে সহায়তা করতে পারে তার ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণের জ্ঞান পদ্ধতি গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়। বন (forests) হচ্ছে খাদ্য, গোখাদ্য, জ্বালানি, আঁশজাতীয় সামগ্রী, কাঠ, ওষুধ, তেল ও রঞ্জক দ্রব্য প্রভৃতির প্রধান উৎস।

আমাদের প্রতিবেশী ভারত পৃথিবীর অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল। সে দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার বনাঞ্চলে প্রায় ৯ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ৩৯ শতাংশ কেবল এ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। দক্ষিণের পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলেও ৪ হাজারের মতো উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। শতকোটি মানুষের দেশ এই ভারতে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের এক বড় অংশেরই বাস। আর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা কৃষিজ জীববৈচিত্র্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মধ্য-ভারতের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে বন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছত্তিশগড়, সাঁওতাল পরগনা, বস্তার ও সাতপুরা এলাকার উপজাতীয়দের জন্য 'মহুয়া' একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গাছ হিসেবে বিবেচিত। ছোট কাণ্ডবিশিষ্ট বেশ বড় ও স্বল্পস্থায়ী এ গাছটিকে ভারতের বনাঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাছ হিসেবে গণ্য করা হয়। মহুয়া ফুলের পুরু পাপড়িগুলো কাঁচা অবস্থায় কিংবা রান্না করে বা শুকিয়ে খাওয়া হয়। কখনো কখনো পাঁপড়িগুলো গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। এর বীজ থেকে যে ঘন সাদা তেল পাওয়া যায়, উপজাতীয়রা তা রান্নার কাজে বা আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করে থাকে। মধ্যভারতের বন এলাকার বাসিন্দাদের কাছে মহুয়াই হচ্ছে জীবন। মধ্য প্রদেশে উপজাতীয়দের প্রধান খাদ্য ধান ও ভুট্টা হলেও সেখানকার বেশিরভাগ মানুষই সম্পূরক খাদ্য হিসেবে বন্য গাছপালা থেকে আহরিত লতা-পাতা, ফল-ফুল, বীজ, শিকড়, দানা প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে। আর বনাঞ্চলে এগুলো পাওয়াও যায় প্রচুর পরিমাণে।

বস্তার এলাকার উপজাতীয়রা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর অর্ধেকই বনজ উৎস থেকে আহরণ করায় ওই এলাকায় কখনো দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব দেখা দেয়নি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মধ্য প্রদেশে উপজাতীয়রা যেসব বন্য উদ্ভিদ প্রজাতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে তার সংখ্যা ১৬৫। এগুলো হচ্ছে বৃক্ষ,

লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর মধ্যে ৩১ প্রকার উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলোর বীজ আগুনে পুড়িয়ে বা রান্না করে খাওয়া হয়। ১৯ প্রকার উদ্ভিদের শিকড় ও কন্দ (tuber) আগুনে সেঁকে, সেদ্ধ করে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করার পর খাওয়া হয়। ১৭ রকমের গাছ আছে যেগুলোর রস তাজা অবস্থায় গাঁজানোর পর লোকজন খেয়ে থাকে। ২৫ রকমের গাছের পাতা এবং ১০ প্রকার গাছের ফুলের পাপড়ি খাওয়া হয় সবজি হিসেবে। ৬৩ রকম গাছের ফল কাঁচা ও পাকা অবস্থায় কিংবা ভেজে অথবা আচার বানিয়ে খাওয়া হয়। ভারতের মালনাদ বনভূমিতে প্রচুর কেশরকা (*Strychnos muxuomica*) গাছ রয়েছে। গাছগুলো ৫ থেকে সাড়ে ৭ ফুট লম্বা হয়। এসব গাছের বালাইনাশক (pesticidal) গুণ রয়েছে বলে স্মরণাতীতকাল থেকে এ অঞ্চলের কৃষকরা জেনে আসছে। এছাড়া আমলা বা আমলকী গাছের পাতা, ছাল (bark) এবং ডাল-পালাও কৃষকরা বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে ব্যাপকভাবে।

এ দুটো গাছের সংশ্লিষ্ট অংশগুলো পরিমাণমতো নিয়ে ১০ থেকে ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ঘণ্টা দুয়েক সিদ্ধ করা হয়। এর সঙ্গে যোগ করা হয় গবাদি পশুর মূত্র। এভাবে একটি ঘন দ্রবণ তৈরি করা হয়। পরে প্রতি এক লিটার দ্রবণ ১৮ লিটার পানিতে মিশিয়ে এটিকে বালাইনাশক হিসেবে এক একর ফসলের জমিতে ব্যবহার করা হয়। মেরু অঞ্চলের তুষারাবৃত উঁচু ও শুকনো জমিতে কৃষকরা নালিতার (*Hibiscus cannabinus*) বীজ বুনে থাকে উইপোকার আক্রমণ রোধ করার জন্য।

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যা কম নয়। আর এ জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিপ্রধান এ দেশটিও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এ দেশে রয়েছে কমপক্ষে পাঁচ হাজার প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৫০০ প্রজাতির মাছ যার মধ্যে চিংড়িই রয়েছে প্রায় ৩০ প্রজাতির। আছে ১৯৮ প্রজাতির উভচর প্রাণি, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, আর একশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণি। এক সময় এখানে ধান পাওয়া যেত ১০ হাজার রকমের।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৬৩ সালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার মুলাডুলি হাটে কালপাগ, ঝিঙ্গাশাইল, পাকড়ী কালাবকরী, আজালদিঘি, কাজলগরী, ধলদিঘি, দলকচু, হিদি, খরাজমড়ী ইত্যাদি দেশি জাতের ধান পাওয়া যেত। বর্তমানে সেখানে আগের এসব স্থানীয় বা দেশি জাতের ধান আর পাওয়া যাচ্ছে না। তার বদলে হাটে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের উফশী ও হাইব্রিড ধান। ১৯৬৩ সালের তুলনায় ১৯৯৯ সালে এ এলাকায় কৃষিতে অনেক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আগে জমিতে গরু দিয়ে চাষাবাদ করা হতো। কোনো রাসায়নিক সার ছিল না। গোবর ও ছাই দিয়ে কৃষক জমির উর্বরতা বাড়াত। কোনো ডিপ টিউবওয়েল বা

শ্যালোমেশিন ছিল না। কেননা জমিতে তেমন পানির প্রয়োজন হতো না; যদি প্রয়োজন পড়ত তাহলে ভূ-উপরিস্থিত পানি, যেমন–পুকুর, ডোবা, খাল-বিল থেকে দোন দিয়ে সেচ দেওয়া হতো। জমিতে পোকার উপদ্রব ছিল না। রোগ-বালাইও ছিল কম। এখন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত ও হাইব্রিড ধান চাষ করায় পোকা ও রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ বাড়ছে। কৃষকের নির্ভরতা বাড়ছে রাসায়নিক কীটনাশকের ওপর। বাড়ছে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও। সেচের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি।

বেশি উৎপাদনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন উন্নত জাতের ও ভালো মানের বীজ। এক সময় আমাদের দেশের কৃষকসমাজ নিজেদের উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বীজই ব্যবহার করত। জনসংখ্যার চাপে, অধিক খাদ্য উৎপাদনের তাগিদে এবং কৃষি কৌশলের বিবর্তন ধারায় ধীরে ধীরে তারা বীজের জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একটা সময় পর্যন্ত এ নির্ভরশীলতা ছিল মূলত সরকারি সংস্থা বিএডিসির বীজের ওপর। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থে তথাকথিত ঋণদাতাগোষ্ঠীর চাপে দিনে দিনে বিএডিসির কার্যক্রম বলতে গেলে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। আর এ সুযোগে ফায়দা লুটছে মুনাফালোভী কিছু আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও কিছু এনজিও। একদিকে তারা মেয়াদোত্তীর্ণ, ভেজাল ও খারাপ বীজ দিয়ে প্রতারিত করছে কৃষকদের। অন্যদিকে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আমদানি করা হাইব্রিড বীজ। হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়। এ বীজ মোটেই পরিবেশ বান্ধব নয়। এ বীজ ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক লাগে অনেক বেশি। এ ছাড়া এতে বীজের অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে কৃষকের।

১৯৭০ সালে বিশ্বে আম উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান ছিল চতুর্থ। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। ১৯৯৭ সালের কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট আমের পরিমাণ ১ লাখ ৮৬ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন। অর্থাৎ গড়ে মাথাপিছু আমের পরিমাণ ১১ কেজি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র দেশ হাইতিতে এ পরিমাণ ৩৫৫ কেজি।

বাংলাদেশের বাজারে মাত্র কয়েকটি জাতের আম দেখা গেলেও এখানে এখনো আমের জাতের সংখ্যা নেহাত কম নয়। শুধু মেহেরপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায়ই প্রাথমিক অনুসন্ধানে কমপক্ষে ৩৩১টি জাতের খোঁজ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুরে ৬৫টি এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৬৬টি জাতের সন্ধান মিলেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায়ই কমবেশি আম উৎপাদন হচ্ছে। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গায় আমের চাষ হয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে।

এ দেশে গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য মানুষ এখনো তাদের আহারসামগ্রীর একটি বড় অংশ পেয়ে থাকে প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো গাছ, লতা-পাতা, মাছ, পাখি প্রভৃতি থেকে। কুড়িয়ে পাওয়া হরেক রকম শাকের মধ্যে আছে কলমি, হেনচি, হেলেঞ্চা, ঘিমা, দণ্ডকলস, কাঁটাখুইড়া, লেটপেটা, বথুয়া, চীনা শাক, ঢেঁকি শাক, বিভিন্ন ধরনের কচু ও কচুর লতা ইত্যাদি। শাক ছাড়াও কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে আছে শাপলা, শালুক, কুঁই, সিংড়া ইত্যাদি। অনেক এলাকায় দরিদ্র ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে পাওয়া এসব শাক-সবজি বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

ভারত ও বাংলাদেশের কৃষকরা জমিতে সবুজ সার ও জৈব সার ব্যবহারের জন্য জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে নির্ভরশীল তাদের গবাদি পশুর খাদ্যসামগ্রীর জন্যও। মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করলে তাতে খনিজ দ্রব্য, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে খনিজদ্রব্য গঠনের উপকরণগুলো হচ্ছে নুড়ি ও পাথর, বালি, পলিকণা ও কর্দমকণা। আর মৃত্তিকা জৈবপদার্থ গঠনের উপকরণের মধ্যে আছে বিয়োজনশীল জৈবপদার্থ, অবিয়োজিত উদ্ভিদাংশ, হিউমাস ও জীবিত প্রাণি। জৈবপদার্থ মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। এখান থেকে ধীরে ধীরে পুষ্টি উপাদান মাটিতে ছড়ায় এবং তা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয়। গাছ, লতা-পাতা, শস্যকণা, ঘাস, লিগিউম জাতীয় গাছ, আগাছা, ফার্ন, শৈবাল ইত্যাদি থেকে সবুজ সার পাওয়া যায়। সবুজ সার উৎপাদনকারী ফসল বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩৬ থেকে ৬০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন সরবরাহ করে থাকে। নাইট্রোজেন সরবরাহ করা ছাড়াও মাটির গুণাবলিতে সবুজ সারের ক্রমপুঞ্জীভূত প্রভাব অপরিসীম।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রচলন শুরু হওয়ার আগে এ অঞ্চলের কৃষকরা নানা ধরনের উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উপাদানকেই এসব কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করত। তাতে পরিবেশে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি।

এক সময় মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো এমন উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার। কৃষি যুগের সূচনা হওয়ার পরও একটা সময় পর্যন্ত অবস্থাটা তা-ই ছিল। এগুলোর মধ্যে কমপক্ষে তিন হাজার রকমের উদ্ভিদ মানুষ নিয়মিত আহার্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর এসব উদ্ভিদের মধ্যে মানুষ চাষ করত মাত্র দেড় শর মতো। বর্তমানে আমাদের খাদ্যভিত্তি যে প্রধান কয়েকটি ফসলের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে ঘটনাটা শুধু তা-ই নয়; এর বৈচিত্র্যও হ্রাস পেয়েছে মারাত্মকভাবে। সারাবিশ্বে এখন মোট খাদ্যসামগ্রীর ৭৫ শতাংশের

সরবরাহ আসছে মাত্র আটটি ফসল থেকে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসাব অনুযায়ী ১৯০০ সালের পর বিশ্বে ফসলের জাতগুলোর প্রায় ৭৫ শতাংশ বিলুপ্ত হয়েছে। বিশ্বের জনগণ এখন তাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৯০ শতাংশ পাচ্ছে মাত্র ২০ প্রজাতির শস্য থেকে। আর চাল, যব, গম ও আলু—শুধু এই চার প্রকার শস্য মানুষের মোট ক্যালরির ৫০ শতাংশ জোগান দিচ্ছে।

বিচিত্র ধরনের গবাদি পশুসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে ভারতের ব্যাপক খ্যাতি রয়েছে। স্থানীয় পরিবেশ ও জলবায়ুর অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য গবাদি পশুর নানা জাতের উদ্ভব হয়েছে। এ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে এদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এসব জাতের গবাদি পশুর সংখ্যা কয়েক দশক ধরে কমতে কমতে বর্তমানে অনেক জাতের বিলুপ্তিই ঘটতে যাচ্ছে।

ভারত, বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে গবাদি পশুর অপরিসীম গুরুত্বের কথা বাড়িয়ে বলার দরকার হয় না। এ অঞ্চলে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। হালচাষ তো বটেই, মালপত্র পরিবহন এবং যাত্রী বহনের কাজেও এসবের ব্যবহার ব্যাপক। গোবরকে সার হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি রান্নার জ্বালানি হিসেবেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আর মাংস, উল, চামড়া এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী, যেমন—দুধ, দই, ছানা, মাখন, ঘি, পনির প্রভৃতির গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করে না বললেও চলে।

জীববৈচিত্র্য স্বাস্থ্য পরিচর্যারও মূল ভিত্তি

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে আসছে মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এখনো প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি ও উপকরণের ওপর আস্থা হারায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই (৪০০ কোটির বেশি) রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রধানত প্রাচীন বা লোকজ ওষুধের (traditional medicine) ওপর নির্ভরশীল। চীন ও ভারতে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ প্রাচীন ওষুধ তৈরি করা হয় উদ্ভিদ থেকে। চীনের হারবাল বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার কাজেই কেবল পাঁচ হাজার প্রজাতির গাছ ব্যবহৃত হয় বনাঞ্চল থেকে।

ভারতবর্ষে ভেষজ উদ্ভিদভিত্তিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এক সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার বৈচিত্র্যময় ভেষজ উদ্ভিদের বিশাল ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করেই এ জ্ঞান বিকশিত হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এসব জ্ঞান পদ্ধতি টিকে আছে। বর্তমান সময়েও ভারতে স্বাস্থ্যসেবার ৭০ শতাংশের বেশি চাহিদা মিটিয়ে

থাকে এসব পদ্ধতি। এক জরিপে দেখা গেছে, স্থানীয় আদিবাসীরা সাড়ে সাত হাজার প্রজাতির উদ্ভিদকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তুলসী গাছের অসাধারণ ভেষজ গুণের কারণে বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি অনন্য স্থান দখল করে রেখেছে।

ভারত ও বাংলাদেশে ত্রিফলা নামে পরিচিত হরীতকী, আমলকী ও বহেরা যে কত রকমের রোগ সারানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তার হিসাব দেওয়া কঠিন। এ অঞ্চলে গবাদি পশুর চিকিৎসায়ও ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার লক্ষণীয়। সব জায়গায় স্থানীয় জনগণই তাদের নিজস্ব সম্পদের গুরুত্ব নির্ধারণ করেছে। পারিপার্শ্বিক জীববৈচিত্র্য থেকে বেছে নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদগুলোকে। যেমন–ট্রান্সহিমালয় অঞ্চলে *Ephedra vulgaris* প্রজাতির এক ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ব্রঙ্কো-ডায়োলেশন তথা শ্বাসকষ্ট উপশমের গুণ বিদ্যমান। আর এ উদ্ভিদটি কেবল ওই অঞ্চলের বাস্তুসংস্থানেই (ecosystem) জন্মে। ট্রান্সহিমালয় এলাকার বাসিন্দারা সাধারণত এটিকে আয়ুর্বেদীয় চা হিসেবে ব্যবহার করে। দিনে কয়েকবার তারা এ চা পান করে থাকে।

বাংলাদেশের চান্দাবিল এলাকার মানুষ রক্ত আমাশয়, জ্বর, ভাইরাল হেপাটাইটিস (জন্ডিস) প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের জন্য রক্তশাপলা ও পান শিউলি ব্যবহার করে। কাটা-ছেঁড়া ও ভাঙা জোড়া লাগাতে ব্যবহার করা হয় বিষ কাঁটালি ও করলি। বিলের শামুকের স্বচ্ছ পানি চোখ ওঠা রোগের মহৌষধ হিসেবে এলাকায় জনপ্রিয়।

প্রকৃতপক্ষে ফার্মাকোলজির লোকজ জ্ঞানই (indigenous knowledge) হচ্ছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র; কেননা এ শাস্ত্রে পুরো দেহ সম্পর্কেই ধারণা পাওয়া যায়। একে দ্রব্যগুণ শাস্ত্রও বলা হয়। এ শাস্ত্রে উদ্ভিদের জৈবিক কার্যাবলি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। ভারতে আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রের বই-পুস্তকে প্রায় ১ হাজার ৪০০ রকমের উদ্ভিদ, ইউনানি শাস্ত্রের বইয়ে ৩৪২ রকম এবং সিদ্ধ শাস্ত্রের বইয়ে প্রায় ৩২৮ রকম উদ্ভিদের উল্লেখ রয়েছে। জৈববৈচিত্র্যভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী এখানে প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ৭৪০ জন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, ২৯ হাজার ৭০১ জন ইউনানি বিশেষজ্ঞ এবং ১১ হাজার ৬৪৪ জন সিদ্ধ বিশেষজ্ঞ কর্মরত আছেন বলে কয়েক বছর আগের এক সমীক্ষায় জানা যায়। সারা ভারতের যে-বিপুলসংখ্যক বয়স্ক লোক ও গৃহবধূ সাধারণ রোগ-ব্যাধি সারাতে নিজেরাই ঘরে বসে গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করছেন তাদের অবশ্য এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ইউনানি ওষুধ কোম্পানির সংখ্যা ২৪২ এবং মোট ওষুধের সংখ্যা ৬৭০। আয়ুর্বেদিক কোম্পানি আছে ১৭৮টি। এদের

উৎপাদিত ওষুধের সংখ্যা ৩৫০৬। এ দেশে বছরে ৬০০ কোটি টাকার ট্রাডিশনাল মেডিসিন উৎপাদন ও বিক্রি হয়। অন্যদিকে অ্যালোপ্যাথি ওষুধের উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এ ধরনের প্রাচীন শাস্ত্রীয় চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। সেখানে প্রায় তিন হাজার প্রজাতির উঁচু শ্রেণীর উদ্ভিদ প্রাচীন ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদের ব্যবহার হয় ব্যাপকভাবে।

অ্যালোপ্যাথি ওষুধের ক্ষেত্রেও ওষুধ তৈরির ৭৬টি প্রধান উপাদানই সংগ্রহ করা হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ থেকে। *Atropa belladonna* উদ্ভিদ থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক উপাদান অ্যাট্রোপিন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে অ্যান্টিকোলিনার্জিক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। *Digitalis purpurea* থেকে প্রাপ্ত ডিজক্সিন হৃদরোগে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। মাত্র ৭টি উপাদান সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য আমরা জীববৈচিত্র্যের ওপর কতখানি নির্ভরশীল।

ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে একটি দিকনির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে ১৯৯৮ সালে ৫০ জনের বেশি ফার্মাকোলজিস্ট, অর্থনীতিবিদ ও জীববিজ্ঞানী এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সে বৈঠকের ঘোষণায় (চিয়াংমাই ঘোষণা) ভেষজ উদ্ভিদ তালিকাভুক্ত ও সংরক্ষণ করার জন্য আরো ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে 'জীবন রক্ষাকারী উদ্ভিদ বাঁচাও' (Save the Plants that Save Lives) নামে একটি কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছিল।

সামুদ্রিক বা জলজ প্রাণবৈচিত্র্য এবং মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা

বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি দরিদ্র মানুষ মাছ ধরে তাদের পূর্ণ বা আংশিক জীবিকা নির্বাহ করে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) এক হিসাব থেকে জানা যায়, বিশ্বে ১০ লাখ বড় আকারের জেলে নৌকা বা ট্রলার রয়েছে। আর মাছ ধরার ছোট নৌকা আছে ২০ লাখ। এই বড় আকারের ফিশিং ভেসেলগুলো লাগামহীনভাবে মাছ ধরে (over-fishing) সমস্যা সৃষ্টি করছে। আর এগুলোর বেশিরভাগই বড় বড় বহুজাতিক করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এরা মাছ ধরা থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণসহ সব ধরনের মৎস্য ব্যবসার মালিক। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে এরা দক্ষতার সঙ্গে ছোট-বড় সব ধরনের মাছ ধরে ফেলার পূর্ণ আয়োজন করে রেখেছে। মাছের ঝাঁকের গতিবিধি শনাক্ত করে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জালকে সেদিকে টেনে নেওয়ার কলাকৌশলও এরা রপ্ত করে ফেলেছে অধিক মুনাফার লোভে। আয়ারল্যান্ডে 'গ্লোবিয়া' নামের এক ধরনের বিশাল আকৃতির জাল (super trawl net) বানানো হয়েছে, যার মুখের

আকৃতি হচ্ছে ১১০ মিটার x ১৭০ মিটার। ডজনখানেক বোয়িং জাম্বো বিমান একসঙ্গে গিলে ফেলার জন্যও মুখটি যথেষ্ট।

প্রযুক্তির অগ্রগতিকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ফলে বাণিজ্যিক রীতিনীতির কাছে সমাজের অন্য সব মূল্যবোধই তুচ্ছ হয়ে পড়ছে। প্রতিবেশগত দিক দিয়ে এটি খুবই বিপজ্জনক ও অমার্জনীয়। ব্যাপকভাবে মাছ ধরার ফলে শুধু সাধারণ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকাই ব্যাহত হচ্ছে না; জলজ জীবপ্রজাতির বৈচিত্র্যও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। কেননা ট্রলারের মাধ্যমে মাছ ধরার সময় মাছের রেণু পোনাসহ সব মাছ তো ধরে ফেলা হয়ই, এমনকি সাগর বা নদীর তলদেশ পর্যন্ত তছনছ করে দেয়া হয়। এভাবে জলজ প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরবর্তী কালে মাছের বংশবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আর তাৎক্ষণিকভাবে এর খেসারত দিতে হয় স্থানীয় গরিব মৎস্যজীবীদের। কেননা এর ফলে তাদের একমাত্র জীবিকার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মালয়েশিয়ায় ১৭ থেকে ১৮ বছর আগে যখন সরকার বাণিজ্যিক ট্রলারকে মাছ ধরার অনুমতি দেয় তখন উপকূলীয় জেলেরা এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

ভারতে বাগদা চিংড়ি একটি রপ্তানি পণ্য হিসেবে চালু হওয়ার পর মৎস্য আহরণ ও স্থানীয় ভোগের পরিমাণ কমতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বছরে ৫ শতাংশ হারে বাড়ছিল। রপ্তানিমুখী মৎস্য 'উন্নয়ন' কর্মসূচি হাতে নেয়ার পর আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ এ হার কমে যায়। ভারতে মৎস্য ভোগের পরিমাণ বছরে মাথাপিছু ১৯ কেজি থেকে কমে এখন ৯ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এ হার কমে হয়েছে ৭ দশমিক ৯ শতাংশ, আর আফ্রিকায় ২ দশমিক ৯ শতাংশ। অপরদিকে ইউরোপে তা বেড়ে হয়েছে ২৩ শতাংশ। বাংলাদেশে চান্দাবিল এলাকার জলজ প্রাণবৈচিত্র্য বাণিজ্যিক কারণে ধ্বংসের মুখে এসে পড়লে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মৎস্য প্রকল্প চালু করেও উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এর মাশুল গুনছে বিল এলাকায় বসবাসরত অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ, বিলের মাছ যাদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর, কাশিয়ানী ও সদর থানার ৪৪টি গ্রাম নিয়ে এ বিলের বিস্তার। এর আয়তন ১০ হাজার ৮৭৩ হেক্টর। ছোট-বড় সব মিলিয়ে বিলে পুকুর আছে তিন হাজারের বেশি। এগুলোর একেকটির আয়তন পাঁচ শতক থেকে সাত একর পর্যন্ত। গবেষকরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ বিলে ৫৫ প্রজাতির মাছ এবং ৩ প্রজাতির চিংড়ি শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে চিতল, কালবাউশ, টাটকিনি, আইড়সহ মোট ৩০ প্রজাতির মাছ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। দেশি সরপুঁটি, অ্যালং ও বামোস মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে গবেষকদের ধারণা। আগে বিলে ১২ বছর বয়সী মাছও পাওয়া

যেত। এসব মাছকে লোকে 'বারইসা' বলে ডাকত।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের (বিসিএএস) তথ্য থেকে জানা যায়, চান্দাবিলের পানির প্রধান উৎস ছিল মধুমতী নদী ও কুমার নদ। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে বিলে পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এলাকায় পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

সার ও কীটনাশকনির্ভর বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা এবং ইজারাদারদের অবাধে মাছ ধরা, এমনকি মাছের রেণু পোনা পর্যন্ত ধরে ফেলাও বিলে স্থানীয় প্রজাতির মাছ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

পাখি, উভচর প্রাণি ও সরীসৃপ বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। কিন্তু বর্তমানে কচ্ছপ, ঝিনুক, কাঁকড়া, সাপ ইত্যাদিও দ্রুত কমে যাচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে বিলের শামুক সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয় খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চলের চিংড়িঘের ব্যবসায়ীদের কাছে। অথচ শামুক জলাভূমির খাদ্য-শৃঙ্খলের (food chain) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শামুক অনেক কিছুই খায় এবং একই সঙ্গে এটি অন্য অনেক প্রাণির খাবারও। যেখানে শামুক বেশি থাকে সেখানকার পানি স্বচ্ছ হয়। পানি পরিষ্কার রাখার এ কাজটি শামুকই করে বলে মনে করা হয়। আবার যেসব জলাশয়ে প্রচুর শামুক থাকে সেখানে মাছের প্রাচুর্যও লক্ষ করা যায়। সরকারিভাবে বিলে যে কার্প জাতীয় মাছের পোনা ছাড়া হচ্ছে তাও স্থানীয় প্রজাতির মাছের জন্য ক্ষতিকর বলে অনেকে মনে করেন।

এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে মিঠাপানির মাছ ছিল ২৭০ প্রজাতির। এগুলোর মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ এরইমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা হওয়ার পথে। বাংলাদেশের প্রায় সব বিল-হাওর এলাকার জলজ প্রাণবৈচিত্র্যই বলতে গেলে একই রকম সংকটে নিমজ্জিত। এমনকি সামুদ্রিক প্রাণবৈচিত্র্যও ধ্বংসের মুখে। ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারি দৈনিক সংবাদ-এ একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বেপরোয়া কারেন্ট জাল ব্যবহারের পরিণতি : বঙ্গোপসাগরে কমে যাচ্ছে মাছের মজুদ'।

বিশ্বায়ন কী করে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে

বিশ্বায়ন (globalization) এমন একটি প্রক্রিয়া, যা এক-সংস্কৃতি (monoculture) ও একরূপতা (uniformity) ভিত্তিক বৈশ্বিক ভোগ ও উৎপাদনরীতির জন্ম দেয়। এ ভোগ ও উৎপাদনরীতি পর্যায়ক্রমে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণের জীববৈচিত্র্যনির্ভর ভোগরীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। মূলত স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই দরিদ্র জনগণের টেকসই জীবিকা এবং ভোগের বিনাশ ডেকে আনা হয়। প্রধানত তিন রকম উপায়ে বিশ্বায়ন

জীববৈচিত্র্য ও তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবিকার ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সামনে আসে শিল্পোন্নত দেশগুলোর বর্তমান বিনিয়োগ কৌশলের বিষয়টি। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিশ্বব্যাপী অবাধ বিচরণ তথা বিনিয়োগের ক্ষমতা পেয়েছে। পাশাপাশি উত্তর গোলার্ধের উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশবাদী আন্দোলনও জোরদার হয়েছে। ফলে এসব দেশের বিনিয়োগকারীরা দক্ষিণ গোলার্ধের জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ দেশগুলোতে মারাত্মক দূষণযুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। আর এভাবে এ অঞ্চলের জৈববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক ভোগরীতির দরুন যে একরূপতা ও এক-সংস্কৃতিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতির তাগিদ সৃষ্টি হচ্ছে সেটিও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই উৎপাদনরীতির ফলে ক্ষুদে উৎপাদকরা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের তৃতীয় খড়্গটির নাম মেধাস্বত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার (Intellectual property rights)।

জীববৈচিত্র্য এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের ওপর দরিদ্র মানুষের অধিকার বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ আইন বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। জীববৈচিত্র্যের দূষণ একটি ক্রমিক প্রতিক্রিয়া ধারার (chain reaction) সূচনা করে। কোনো একটি বাস্তুসংস্থানে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হলে তার প্রভাব পড়ে সেখানকার অন্যসব প্রজাতির ওপরও। কেননা এ অগণিত জীবপ্রজাতির পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-বি-নময় ও খাদ্য-শৃঙ্খলের (food web and food chain) সম্পর্ক বিদ্যমান। এ বিষয়ে মানুষের ধারণা একেবারেই সামান্য। জীববৈচিত্র্যের সংকট কেবল জীবপ্রজাতিগুলো বিলুপ্তির মাধ্যমে শিল্পের কাঁচামালের জোগান বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এর ফলে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থোপার্জন বাধাগ্রস্ত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আসল বিপদটা হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এর ফলে জীবিকা তথা বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পাবে না।

জীববৈচিত্র্য জনগণের সম্পদ। শিল্পোন্নত দেশ ও শহরের বিত্তবান নাগরিকরা জীববৈচিত্র্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিলেও তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য মানুষ তাদের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, জ্বালানি, আঁশ, আশ্রয়—সবকিছুর জন্য ক্রমাগতভাবে জৈবিক উৎসের ওপর নির্ভর করছে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা ও অতিরিক্ত সক্ষমতার দরুন উন্নত দেশগুলো বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই স্টিল কারখানা বন্ধ করে দিতে শুরু করে। অপরদিকে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় জনসাধারণকে সামাজিক ও পরিবেশগত কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেখানে এ ধরনের ভারি শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।

কয়েক বছর আগে ভারতের টাটা স্টিল অ্যান্ড আয়রন কোম্পানি লিমিটেড (টিসকো) ৭ হাজার কোটি রুপির একটি রপ্তানিমুখী স্টিল প্লান্ট গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। এ প্রকল্প উড়িষ্যার গাঞ্জাম জেলার সারদা ব্লকের পাইপালপঙ্কা রিজার্ভ ফরেস্টের ১২টি গ্রাম এবং ছাতারপুর-বহরমপুর তহসিলের ২৫টি গ্রামের হাজার হাজার বাসিন্দার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকল্পটির জন্য বছরে ৪৪ লাখ টন আকরিক লোহা (কাঁচামাল) দরকার। আর এ জন্য দরকার ৪০ কোটি টন আকরিক লোহা সব সময় মজুদ করে রাখা। এ লক্ষে টিসকো একটি খনি খননের জন্য উড়িষ্যার কিওনঝার ও সুন্দরগড় জেলার মনকদনাচা বালিয়াপাহাড় এলাকায় ৩৮ বর্গ কিলোমিটার জমি লিজ নেওয়ার আবেদন জানায়। জাপানের নিপ্পন স্টিল করপোরেশনকে এ কাজে প্রযুক্তিগত কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। এছাড়া আরো অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত হওয়ার লক্ষে চেষ্টা-তদবির চালায়।

বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন এবং শ্রমিকদের কলোনি গড়ে তোলার জন্য দেড় হাজার একর জমি ছাড়াও টিসকো আরো ৫ হাজার একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির সন্ধান করে। কলোনি নির্মাণের ফলে যারা উদ্বাস্তু হবে তাদের বাদ দিয়ে কেবল মূল প্রকল্প এলাকা থেকেই ২৫ হাজারের বেশি লোকের উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

প্রকল্পটির জন্য যে ৫ হাজার একর জমি কেনা বা লিজ নেয়ার চেষ্টা চালানো হয় সেটি জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকা। সেখানে রয়েছে নারকেল, কাঁঠাল, কলা, আম, পেয়ারা, পেঁপে, কাজু বাদাম, লেবু, আনারস, খেজুর, ব্ল্যাক বেরি, রোজ বেরি প্রভৃতির বিশাল বিশাল বাগান। ওই এলাকায় জনগণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কেতকী বা কেওড়া বাগান। অ্যারোমেটিক গুণসমৃদ্ধ এ গাছ স্থানীয় অর্থনীতির মূল খাত। কয়েক পুরুষ ধরে ওই এলাকার বাসিন্দারা তাদের জীবিকার জন্য এ গাছের ওপর নির্ভর করে আসছে।

সঙ্গত কারণেই গোপালপুর এলাকার জনগণ এ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে নিজেদের বাসভূমি, ক্ষেত-খামার এবং কেওড়া বাগান ছেড়ে কোথাও তারা যাবে না।

এ তো গেল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পুঁজি স্থানান্তরের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কথা। এবার আসা যাক বিশ্বায়ন কীভাবে মানুষের ভোগ-রীতি ও উৎপাদন রীতিকে প্রভাবিত করে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে এবং সেই সঙ্গে দরিদ্র জনগণের জীবিকার ওপর আঘাত হানছে সে কথায়।

বিশ্বায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলো দরিদ্র দেশ ও সেসব দেশের জনগণকে তাদের সঙ্গে 'অবাধ প্রতিযোগিতায়' লিপ্ত হতে বাধ্য করছে। আর এর

ফলে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্য-পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটছে, এমনকি উন্নত দেশগুলোতেও বৈষম্য বাড়ছে। দরিদ্র মানুষের অবস্থানকে আরো নাজুক করে দিয়ে তাদের স্থানীয় জৈবিক সম্পদকেও কুক্ষিগত করছে বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠী। ১৫৮টি দেশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত খাদ্য ও কৃষির জন্য প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস সংক্রান্ত লিপজিগ গ্লোবাল প্লান্ট অব অ্যাকশনে বলা হয়েছে, আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারই বর্তমানে জেনেটিক (genetic) বৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধন করছে। বাংলাদেশের চান্দাবিলের শস্য ও জলজ প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে উপনীত হওয়ার পেছনেও কৃষির আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের ভূমিকাকেই প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করছেন গবেষকরা। তাদের মতে, শুকনো মৌসুমে এখন বিলে ইরি ধান চাষ করা হয় ব্যাপকভাবে। এর জন্য কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এ কীটনাশকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিলে মাছের বংশবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এছাড়া বিলে আগের মতো তেমন অনাবাদি জমি না থাকায় মাছের অভয়াশ্রম থাকছে না। বিলের পুকুরগুলো যারা ইজারা নিচ্ছে তারা অধিক মুনাফার জন্য সেচ দিয়ে সব মাছ ধরে ফেলে, ফলে বংশবৃদ্ধির সুযোগ থাকে না।

মার্কিন কৃষি দপ্তর ১৮৯৭ সালে অনুমোদিত ফলের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতে ২৭৫টিরও বেশি জাতের আপেলেরই উল্লেখ ছিল। অপরদিকে বর্তমানে উৎপাদকরা যে কয় জাতের আপেল বিক্রি করছে তার সংখ্যা এক ডজনেরও কম। বিশ্বজুড়ে সুপারমার্কেটগুলোতে এখন মূলত তিন রকম আপেল পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে লাল (যুক্তরাষ্ট্রের স্টারকিং), একটি হলুদ তথাকথিত গোল্ডেন ডেলিশ্যাস, এটিও যুক্তরাষ্ট্রের এবং অপরটি হচ্ছে সবুজ (অস্ট্রেলিয়ার গ্র্যানি স্মিথ বা পেপিন)। ফ্রান্সে বছর কয়েক আগের এক জরিপে দেখা যায়, সে সময় সেখানকার মানুষের আহার্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ। শাক-সবজি, ফল, মসলা, আচার-চাটনি প্রভৃতি নানাভাবে মানুষ সেসব উদ্ভিজ্জ সামগ্রী আহার্য হিসেবে গ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমানে এই অঞ্চলে মাত্র ৬০ প্রজাতির আহার-উপযোগী উদ্ভিদ চাষ করা হয়। এসবের মধ্যে স্থানীয় ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে ৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ।

গ্রিসে গমের জাতের বৈচিত্র্য ৯৫ শতাংশ কমেছে। খাদ্যশিল্প ক্রমেই অধিকতর সমন্বিত ও একীভূত হয়ে পড়াই এর মূল কারণ। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান পর্যায়ে একটি পাউরুটির মোট দামের মাত্র ১৫ শতাংশ প্রায় কৃষক; বাকিটা যায় দুধ মেশানো, বেকিং করা, প্যাকেজিং, পরিবহন ও বাজারজাত করার পেছনে। উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভোক্তার ৯০ শতাংশই প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ করে থাকে। ইউরোপে এখন দুধের ২৫ শতাংশই উৎপাদন করে

এক-চতুর্থাংশ দুগ্ধখামার। বাকি তিন-চতুর্থাংশ খামার জোগান দেয় মাত্র ২৫ শতাংশ দুধ। এছাড়া মাত্র ৬ শতাংশ কৃষিখামার জোগান দিয়ে থাকে ৬০ শতাংশ দানাশস্য। ১০ শতাংশ পোল্ট্রি খামার উৎপাদন করে ৯০ শতাংশ পোল্ট্রি। সেখানে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ কৃষক নিজ নিজ খামার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ইউরোপের ৮০ শতাংশ খামারই এখন মাত্র চারটি শস্য উৎপাদন করে থাকে। ফলে এটা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে অতিকায় একীভূত (giant merger) প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে, তার কাছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদকরা শুধু মার খাচ্ছে তা-ই নয়, অধিক মুনাফার কারণে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো একই সঙ্গে জীববৈচিত্র্য এবং সাধারণ মানুষের জীবিকাকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বিশ্বে এখনো গরিব কৃষকরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রায় ১৫০ কোটি গরিব কৃষক তাদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করে এবং নিজেদের ফসলের বীজও নিজেরা সংরক্ষণ করে। প্রতিবছর বাজার থেকে বীজ কিনে পরবর্তী ফসল ফলানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বিশ্বায়নের সুযোগে মুষ্টিমেয় বহুজাতিক কোম্পানি এখন কৃষকদের সেদিকেই ঠেলে দিতে চাইছে।

ধান ও গম পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গরিব মানুষের খাদ্য। ১৯৯৫ সালের হিসাবে দেখা গেছে, কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে গম উৎপাদন করা হয়েছে ২১ কোটি ২০ লাখ হেক্টর জমিতে আর ধান উৎপাদন করা হয়েছে ১৪ কোটি ৯০ লাখ হেক্টরে। এর সবই কৃষকের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে উৎপাদিত। মনসান্টোর মতো মুনাফালিপ্সু বহুজাতিক কোম্পানি এ নিয়ন্ত্রণ কবজা করতে চায়। এ ক্ষেত্রে তার হাতিয়ার হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার বা মেধাস্বত্ব। এটি একটি একচেটিয়ামূলক ধারণা, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্যাটেন্ট ও কপিরাইট।

আগেই বলা হয়েছে, জীববৈচিত্র্য দরিদ্র মানুষের অভিন্ন সম্পত্তি। তারাই এটিকে রক্ষা করে, ব্যবহার করে, আবার পুনরুৎপাদন করে। জীবনের ধারাবাহিকতার যে প্রক্রিয়া তার অংশ হিসেবে তারা পরস্পরের সঙ্গে বীজ, চারা ও পশু পাখি বিনিময় করে। আজকাল জীববৈচিত্র্যকে 'দুনিয়ার সকল জাতির অভিন্ন ঐতিহ্য' হিসেবে অভিহিত করার জোর প্রয়াস চলছে। অথচ প্রতিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি সমগ্র বিশ্বের অভিন্ন বিষয় নয়। জীববৈচিত্র্য হলো কোনো অঞ্চলের সকল জিন (gene) প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের সমষ্টি। একেক দেশ ও অঞ্চলভেদে একেক রকম জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীই এটি ব্যবহার ও রক্ষা করে চলেছে। আসলে জীববৈচিত্র্যকে বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর কাঁচামালে পরিণত করার অশুভ লক্ষ্য থেকেই এ বৈশ্বিক

ধারণাকে সামনে আনা হচ্ছে। অভিন্ন ঐতিহ্যের ধুয়া তুলে শিল্পোন্নত দেশ ও তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কৃষিপ্রধান দেশগুলোর বৈচিত্র্যময় প্রাণসম্পদের ওপর তাদের অধিকার কায়েম করে নিচ্ছে। বলতে গেলে বিনে পয়সায় এসব সম্পদ পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে কৃষিপ্রধান দেশগুলোর কৃষিখাত হয়ে উঠছে তাদের জীবকোষ বদলানোর নয়া জৈব-কারিগরিবিদ্যা দিয়ে তৈরি প্যাটেন্ট করা পণ্যের (genetically engineered pattented agricultural product) বাজার। ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। এমনকি শিল্প বিকাশের বিবেচনায় থাইল্যান্ড ও ভারতের মতো দেশগুলোর সামনেও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কিংবা গ্যাটের (GATT) বাধ্যতামূলক শর্তাবলির কবলে পড়ে পুনরুপনিবেশিকতাবাদের শিকার হওয়ার হুমকি দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশে ভেষজ সামগ্রী হিসেবে হলুদ ও নিমের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। মসলা হিসেবে তো বটেই, গায়ের রং ফর্সা করা থেকে শুরু করে ত্বকের রোগ, কাটা-ছেঁড়া প্রভৃতি নিরাময়ে কাঁচা হলুদের ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আর নিমের ভেষজ গুণ বলে শেষ করা যাবে না। মাধার চুলে দেওয়ার জন্য নিমতেল, দাঁতের মাজন হিসেবে নিম টুথ পাউডার, এমনকি নিমের ডালকেও লোকজন দাঁতন হিসেবে ব্যবহার করে। সর্বোপরি ফসলের ক্ষেতে পোকা-মাকড় দমনের প্রকৃতিক উপায় হিসেবেও নিমের ব্যবহার এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

বছর কয়েক আগে আমাদের এ অঞ্চলের বহুলব্যবহৃত এ দুটি ভেষজ উদ্ভিদের ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের। ১৯৯৫ সালে দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী দাবি করেন, হলুদ থেকে তারা একরকম পাউডার তৈরি করেছেন, যা শরীরের বহিরাবরণে কাটা-ছেঁড়ার ক্ষত নিরাময়কারী ওষুধ হিসেবে কাজ করবে। বিজ্ঞানীদ্বয় আরো দাবি করেন যে, তারাই প্রথম ক্ষত নিরাময়কারী হিসেবে একে কাজে লাগিয়েছেন। আর এ দাবি অনুযায়ী মার্কিন কর্তৃপক্ষ তথাকথিত এই উদ্ভাবনের ওপর প্যাটেন্ট আরোপ করে, যাতে অন্য কোনো দেশ হলুদ দিয়ে এ ধরনের ওষুধ তৈরি করে বাজারজাত করতে না পারে।

ভারতের জনমনে এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান জনসচেতনতা ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায়ার চাপে ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প কাউন্সিল ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্যাটেন্ট অফিসে মামলা করে।

একই ঘটনা ঘটেছে নিমগাছ নিয়েও। ১৮৮৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে নিমজাত সামগ্রীর ওপর ৩৭টিরও বেশি প্যাটেন্ট আরোপ করা হয়, যার বেশিরভাগই কীটনাশক হিসেবে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে Pesticide

Manufacturer Agridyne-এর মতো বৃহৎ কোম্পানিগুলোই শুধু এ স্বত্ব ভোগ করে। এ ৩৭টির মধ্যে মাত্র ৩টি প্যাটেন্ট ভোগ করে ভারতীয় কোম্পানি।

১৯৯৬ সালের শুরুতে মার্কিন সরকারকে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল পাপুয়া নিউগিনির ক্ষুদ্র উপজাতি হাগাহাই সম্প্রদায়ের জনগণের কাছ থেকে লব্ধ জেনেটিক মেটেরিয়ালের ওপর স্বত্ব আরোপ করার ফলে। হাগাহাই সম্প্রদায়ের লোকজনের রক্তে এক ধরনের কোষ আছে, যেটি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিউকেমিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ কোষ নিয়ে গবেষণা করে ক্যান্সার নিরাময়ের একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্যাটেন্ট আরোপের ফলে কিছু কোম্পানির পক্ষে এটিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভের মুখে অবশ্য ওইসব কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে আর তা ব্যবহার করতে পারছে না। তাই বলে প্যাটেন্ট সমস্যার কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয়নি।

আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট আইনের সুযোগ নিয়ে মনসান্টোর মতো বৃহৎ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে তাদের প্যাটেন্ট করা কৃষিপণ্যের কৃষকদের দিয়ে ব্যবহার করিয়ে সারা দুনিয়ার কৃষিব্যবস্থা ও কৃষক সমাজের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ খোলাই রয়েছে। প্যাটেন্ট আইন ভঙ্গের জন্য প্রয়োজনে তারা কৃষককে শাস্তি দিতেও কসুর করবে না। মনসান্টোর মতো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে, কৃষক নিজের বীজ হারিয়ে, কৃষিসংক্রান্ত তার নিজস্ব জ্ঞান ও সম্পদ হারিয়ে মনসান্টোর সঙ্গে দাস শ্রমের চুক্তিতে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে মনসান্টো এরইমধ্যে কয়েক হাজার কোটি ডলার খরচ করে 'ডেল্টা অ্যান্ড পাইন' নামের একটি কোম্পানিকেই কিনে ফেলেছে। কেননা ডেল্টা অ্যান্ড পাইন টার্মিনেটর বীজের প্যাটেন্ট পেয়েছিল। এ বীজ এমনভাবে তৈরি যে একবার লাগালে ফলন হবে, কিন্তু এর বীজ থেকে দ্বিতীয়বার কোনো ফসল হবে না। অর্থাৎ বীজটাই আত্মঘাতী।

১৯৯৮ সালের 'ধরিত্রী সম্মেলনে' ১৩১টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান, ৯ হাজার সাংবাদিক এবং বেশ কয়েক হাজার কর্মকর্তা মিলে দুই সপ্তাহ ধরে আলোচনা করে ২৭টি নীতিমালা সংবলিত একটি চুক্তি সই করেন। এ চুক্তির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–(১) উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য 'জীববৈচিত্র্য কনভেনশন' বা সিবিডি (Convention on Biological Diversity); (২) বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসসংক্রান্ত বিশ্ব উষ্ণতা কনভেনশন এবং (৩) বনাঞ্চল সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও তার নিরাপদ ব্যবহারে একযোগে কাজ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বন সংরক্ষণ নীতিমালা। ১৫৩টি দেশ এ চুক্তিতে

সই করেছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সম্মেলনে টার্মিনেটর বীজ নিয়েও অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ সিবিডিতে সই করলেও টার্মিনেটর বীজ উৎপাদনকারী ও প্যাটেন্ট ধারণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র তাতে সই করেনি। এতে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ; বরং জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের জন্য কৃষি-প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তা বাজারজাত করতেই সে বেশি আগ্রহী।

তথ্যসূত্র

১. Vandana Shiva (বন্দনা শিবা), Biodiversity Consumption Patterns and Globalization Background Papers, Human Development Report 1998.

২. ধরিত্রী, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৭

৩. পাক্ষিক চিন্তা

৪. New Scientist

৫. ইনফরমেটিক্স, জানুয়ারি ১৯৯৭

৬. Hye, HKMA (1992), Ten Years of the Bangladesh Drug Policy.

পরিবেশ ও উন্নয়ন বিতর্কের দিন শেষ

পরিবেশ ও উন্নয়ন–এ দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক বহুকালের পুরনো। দিন দিন অবশ্য এ বিতর্ক কমে আসছে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও জার্মান পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, পরিবেশ বিপর্যয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণ সম্পদ ধ্বংস হওয়ায় প্রতিবছর বিশ্বের সব দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বা ২ লাখ কোটি ইউরো ক্ষতি হচ্ছে। 'দি ইকনোমিকস অব ইকোসিস্টেম অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি' শীর্ষক ওই গবেষণাপত্রটি জার্মানির বনে জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্যবিষয়ক নবম সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয় ২০০৯ সালের নভেম্বরে।[১] ২০০৬ সালে স্টার্ন রিভিউ এই সিদ্ধান্তে আসে যে জলবায়ু পরিবর্তনকে অনিয়ন্ত্রিত রেখে দিলে বিশ্ব জিডিপির ২০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। অথচ এর রাশ টেনে ধরতে ব্যয় হবে বিশ্ব জিডিপির এক শতাংশেরও কম। ২০০৯ সালের নভেম্বরে ঢাকায় ফ্রান্স-বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব স্কলারস অ্যান্ড ট্রেইনিস আয়োজিত এক সেমিনারে বলা হয়, বাংলাদেশে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো গেলে জাতীয় আয়ের সাড়ে তিন শতাংশ অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া সম্ভব। ২০০২ সালের আগস্টে 'টেকসই উন্নয়ন : জোহানেসবার্গ সম্ভাবনা' শীর্ষক এক নিবন্ধে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেমস ডি উলফেনসন উল্লেখ করেছিলেন, 'আমরা যদি সতর্ক না হই, ভবিষ্যতের জন্য উন্নত নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুলি এবং উৎপাদন ও ভোগের বর্তমান প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সামাজিক ও পরিবেশগত অবক্ষয় আমাদের সব ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে, উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হবে না।'

পরিবেশকে গৌণ বিবেচনা করে যারা উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তারা উন্নয়ন শব্দটি আগে এবং পরিবেশকে পরে স্থান দেন; অর্থাৎ বিষয় দুটিকে তারা একত্রে উপস্থাপন করেন 'উন্নয়ন ও পরিবেশ'–এভাবে। অন্যদিকে যারা পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে তারা পরিবেশ শব্দটিকে ঠাঁই দেন আগে। 'উন্নয়ন ও পরিবেশ'–এভাবেই তারা উপস্থাপন করেন

১. Pavan Sukhdev (পবন সুখদেব), The Economics of Ecosystems and Biodiversity, An Interim Report, 2008

পুরো বিষয়টিকে। শুধু তা-ই নয়, পরিবেশ ইস্যুটিকে কে কীভাবে বিবেচনা করেন তার ভিত্তিতে ভিন্নতা দেখা যায় উন্নয়ন মডেলেও।

মানুষকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে গণ্য না করে বরং তাকে প্রকৃতির উপরে সর্বময় প্রভু হিসেবে গণ্য করার মনোবৃত্তিই প্রচলিত উন্নয়ন মডেলের মূল ভিত্তি। প্রচলিত এ উন্নয়ন মডেলটি গড়ে উঠেছে পণ্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। জীবনের অন্য সব দিককে উপেক্ষা করে কেবল বস্তুগত দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয় এতে। এ কারণে এ মডেল অনুযায়ী কোনো দেশের উন্নয়ন ও জনগণের সমৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয় ওই দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP), মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মাথাপিছু আয়কে (Per Capita Income)। দেশে যা কিছু উৎপাদন করা হয় এবং বাজারে বিক্রি করা হয় সেসব দিয়েই পরিমাপ করা হয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন। এর সঙ্গে নিখাদ বৈদেশিক আয় যোগ করে পাওয়া যায় মোট জাতীয় উৎপাদন। আর মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যা পাওয়া যায় তা হলো মাথাপিছু আয়। মাদকদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি এবং অশ্লীল সাহিত্য বা চলচ্চিত্র নির্মাণও জিএনপির অন্তর্ভুক্ত। এসবের উৎপাদন সমাজ বা মানুষের কতটা উপকারে আসে না-আসে তা বিবেচনা করা হয় না মোটেই। প্রচলিত এ উন্নয়ন ধারায় মুনাফাই আসল। এ উন্নয়ন ধারা গড়ে উঠেছে যে-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সেটি হলো economic determinism বা অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ। একে নিয়ন্ত্রণবাদও বলা হয়।

এক সময় এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রকৃতি বা পরিবেশই মানুষের সব কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। বহুকাল ধরে চলে এসেছে এ ধারণা। ইউরোপে নবজাগরণের সময় এ ধারণা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী দাস রাতসেল দ্য গজেলশাফট এ ধারণার প্রধান হয়ে ওঠেন। তাকে সমর্থন করেন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী মোস্পল। নিজের লেখায় মোস্পল উল্লেখ করেন, মানুষ ভূপৃষ্ঠের সন্তান, তার ধুলোর অংশ, যে ধুলো তার হাড়-মাংস-মানসিকতা ও হৃদয়ের মধ্যে মিশে আছে। লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস-এর প্রতিষ্ঠাতা এইচ জে ম্যাকিন্ডারও এমনটিই মনে করতেন। এ ধারণার ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত হিটলারের মন্ত্রণাদাতা কার্ল হশোফার (১৮৬৯-১৯৪৬) নিমিত্তবাদের তত্ত্ব দাঁড় করান। এতে বলা হয়, ঈশ্বর জার্মান জাতকে তৈরি করেছেন নিখাদ আর্য রক্ত দিয়ে আর জার্মানির অবস্থান স্থির করেছেন এমনভাবে যাতে গোটা বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে দেশটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে এ তত্ত্বের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। ততদিনে পশ্চিম ইউরোপে আরেকটি তত্ত্ব দানা বেঁধে ওঠছিল যাকে বলা হয় সম্ভাবনাবাদ। এতে মানুষের কর্মকাণ্ডের নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রকৃতিকে বর্ণনা না করে বরং

মানুষকেই মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, পরিবেশ মানুষের ব্যবহারের জন্য যে-ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখেছে, সেই ভাণ্ডার মানুষ তার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে যেমনটি অন্য কোনো জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এটিও এক ধরনের নিমিত্তবাদ যাতে প্রকৃতির বদলে মানুষকে সর্বশক্তিধর বলে মনে করা হয়। আসলে এ তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের প্রাকৃতিক শক্তির ওপর পুঁজিবাদের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দর্শন হিসেবে কাজ করেছে। এ দর্শনের অনুসারীরা ডারউইনের 'Survival of the fitest' অর্থাৎ যোগ্যতমের পক্ষেই কেবল টিকে থাকা সম্ভব–এ তত্ত্বকেও তাদের মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন; যদিও ডারউইনের তত্ত্বে মানুষের বেলায় একথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নিম্নশ্রেণীর জীবজগত সম্পর্কে।

আঠারো শতকের শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যান্ত্রিক শিল্পায়নের চেষ্টা যতভাবে করা হয়েছে সে তুলনায় খুব সামান্য চেষ্টাই চালানো হয়েছে পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি (Environment Friendly Technology) উদ্ভাবনের জন্য। ফলে গোটা বিশ্বের পরিবেশ আজ বিপর্যয়ের মুখে। এ প্রেক্ষাপটেই উন্নয়নের বিকল্প হিসেবে 'টেকসই উন্নয়ন' (Sustainable Development) শব্দযুগল বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। এ শব্দযুগল সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পায় ১৯৮৭ সালে ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ডাব্লিউসিইডি) প্রকাশিত এক রিপোর্টের মাধ্যমে। এ কমিশন সাধারণভাবে ব্রডল্যান্ড কমিশন নামে পরিচিত। এছাড়া ২০০২ সালে জোহানেসবার্গে জাতিসংঘ আয়োজিত এক সম্মেলনের মূল এজেন্ডাই ছিল টেকসই উন্নয়ন। ওই সম্মেলনটি টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন নামেই পরিচিতি লাভ করে। সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের লক্ষে পাঁচটি বিষয়কে বেছে নেয় জাতিসংঘ। এগুলো হলো কৃষি; পানি ও স্যানিটেশন; জ্বালানি, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য। যদিও জোহানেসবার্গ সম্মেলনেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশবাদীরা। ভারতের বিশিষ্ট পরিবেশবাদী নর্মদা বাঁধবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা বন্দনা শিবা সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেন। তার মতে, রিওতে ধরিত্রী সম্মেলনের এজেন্ডা ছিল যথার্থ। এবার টেকসই উন্নয়নকে এজেন্ডা করে ধনী দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে মাত্র। ব্রডল্যান্ড কমিশনের প্রকাশ করা রিপোর্টের শিরোনাম ছিল 'আওয়ার কমন ফিউচার'। রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে– এটা এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, বিনিয়োগ নির্দেশনা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিভাজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলো শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও

সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ভারতের বিশিষ্ট উন্নয়ন গবেষক কমলা বাসিন টেকসই উন্নয়নকে চিত্রিত করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন হিসেবে যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো জনমুখীনতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, তৃণমূল গণতন্ত্র ইত্যাদি। 'Some Thoughts on Development and Sustainable Development' শীর্ষক এক প্রবন্ধে কমলা বাসিন প্রচলিত উন্নয়ন মডেলকে চিহ্নিত করেছেন চাপিয়ে দেওয়া কর্তৃত্বশীল মডেল হিসেবে। তার মতে, এ উন্নয়ন মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ বৈরিতা, জেন্ডার অসচেতনতা, সামরিকীকরণ ও সমরসজ্জামুখীনতা, একরূপতা ও বৈচিত্র্য হ্রাস ইত্যাদি।

সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের মতে, টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে চাইলে মানবজাতি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অস্তিত্ব রক্ষা এবং যে-ইকোসিস্টেমের ওপর সবার প্রাণ নির্ভরশীল তাকে রক্ষার জন্য গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদেরকে। (If we are to achieve sustainable development, we will need to display greater responsibility for the ecosystems on which all life depends, for each other as a single human community and for the generations that will follow our own living tomorrow with consequences of the decisions we take today.)[২]

পরিবেশ ও উন্নয়নসংক্রান্ত আধুনিক চিন্তাধারায় তাই বিষয় দুটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য আন্তঃসম্পর্কের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে, পরিবেশ ফিচার অবশ্যই উন্নয়ন ফিচারের সঙ্গে এবং উন্নয়ন ফিচার অবশ্যই পরিবেশ ফিচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সেজন্য কোনো উন্নয়নকাজ হাতে নেওয়ার আগে ভেবে দেখা হয় যে ওই উন্নয়ন সম্পন্ন করতে গেলে তার মাধ্যমে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে কি না। কেননা সাময়িক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ নষ্ট করা হলে জনজীবন ও অর্থনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পরিবেশ ও উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থনীতির আলাদা শাখা হিসেবে 'পরিবেশ অর্থনীতি' নামে কোর্স চালু করা হয়েছে।

২. Kofi Annan, secretary general of the UN, public remarks leading to the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, South Africa, August 2002

পরিবেশ ও উন্নয়ন : কোন্ অবস্থায় বাংলাদেশ

স্বাধীনতার পর চার দশকে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি বাংলাদেশে। পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পর থেকে আশির দশকজুড়ে রীতিমতো স্থবিরতা বিরাজ করছিল অর্থনীতিতে। এর মূল কারণ বিভিন্ন সরকারের অনুসৃত উন্নয়ন নীতিমালা। সরকার বদল হলেও নীতির বদল হয়নি। এই উন্নয়ন নীতি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া। বিদেশ-নির্ভরতা, দুর্নীতি ও লুটপাট, বৈষম্য এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ বৈরিতা এ উন্নয়ন নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উন্নয়ন নীতিমালায় প্রকৃতি ও পরিবেশ যে মোটেই গুরুত্ব পায়নি তার বড় নজির এ দেশের অর্থবছরের হিসাবটি। এক বর্ষায় (জুলাই মাস) অর্থবছর শুরু হয়ে আরেক বর্ষায় (জুন) তা শেষ হয়। উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নে এটি বড় বাধা। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হাতে নেওয়া হয় তার চার ভাগের তিন ভাগ বাস্তবায়ন হয় বছরের শেষ অংশে, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে। শেষ অংশের আবার শেষ তিন মাসে (এপ্রিল, মে ও জুন) সবচেয়ে বেশি কাজ হয়। বেশির ভাগ সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এডিপি বাস্তবায়ন দেখানো হলেও জুলাই-আগস্ট মাসেও কাজ চলতে থাকে। অথচ বাংলাদেশে বৃষ্টি শুরু হয় মার্চ থেকে। জুন-জুলাইয় থাকে ঘোর বর্ষা।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের নিয়ে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নথিপত্রের কাজ বর্ষায় শেষ করে শুকনো মৌসুমে উন্নয়নকাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। এতে পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়েছে তা বলা যাবে না। কারণ মানুষকে আসছে বর্ষায়ও খোঁড়াখুঁড়ির নগরীতে কাদাপানিতে একাকার হয়ে চলাচল করতে হবে। অর্থবছর শেষ হওয়ার আগে বেশির ভাগ এলাকায় তড়িঘড়ি করে জুন মাসের মধ্যে ঠিকাদাররা কাজ শেষ করে টাকা পেতে চাইবেন। প্রধানমন্ত্রী সমস্যাটি ধরতে পারলেও স্থায়ী সমাধানের দিকে যাননি। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব অর্থবছর গণনার পথ খুঁজে পাননি।

এ দেশে বাজেটপ্রক্রিয়া সারা বছর চার কোয়ার্টারে বিভক্ত। প্রথম কোয়ার্টার (জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর) বন্যায় বিপর্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) হয় শীতের আগমন। তৃতীয় কোয়ার্টার (জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ) শেষে বিদায় নেয় শীত। চতুর্থ কোয়ার্টারে

(এপ্রিল, মে ও জুন) দেখা দেয় আগাম বন্যা। অক্টোবর-নভেম্বর সাইক্লোনের মাস, এপ্রিল-মে আগাম বন্যার মাস। অতএব উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রকৃত কাজের সময় পাওয়া যায় ডিসেম্বর থেকে মার্চ; অর্থাৎ দেড় কোয়ার্টার সময় মাত্র। জুনের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার তাগিদ থাকে। তাই বর্ষার শুরুতে তড়িঘড়ি করে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করতে হয়। সরকারের বর্তমান অর্থ পরিকল্পনা এমন যে, তাতে শেষ কোয়ার্টারের দুর্যোগের জন্য বিশেষ বিবেচনা থাকে না। দুষ্ট লোকেরা এরই সুযোগ নেয়। তারা সামান্য কিছুতেই খারাপ আবহাওয়ার অজুহাত দিয়ে কাজ খারাপ করে। এ অজুহাতে তারা প্রকল্পটি ত্রুটিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেয় অথবা সরকারকে বেকায়দায় ফেলে সময় ও ব্যয় বাড়িয়ে নেয়। আবার অনেক সময় কাজ না করেও ঠিকাদাররা অর্থ তুলে নেয়। এসব নিয়ে অভিযোগ তোলা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়ার রেওয়াজ তেমন নেই। বড়জোর এক মন্ত্রণালয় থেকে তাঁদের অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়। কিন্তু কিছুতেই অর্থবছর পাল্টানোর কথা তাঁরা বলেন না।

একজন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষক সম্প্রতি একান্ত আলাপচারিতায় জানান, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিতকে তিনি একবার বুঝিয়ে রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন পরের বছর জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত একটি ইন্টেরিম বাজেট দিয়ে তারপর থেকে এপ্রিল-মার্চ অর্থবছর চালু করার বিষয়ে। কিন্তু প্রকল্পে দুর্নীতির সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।

এ দেশে অর্থবছরের হিসাবটা অবশ্য বরাবর এ রকম ছিল না। ফসল উৎপাদন ও খাজনা আদায়ের সুবিধার কথা বিবেচনা করে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সন গণনা শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এমনকি ছোটো শহরগুলোতেও এখনো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা সন অনুসরণ করা হয় ব্যাপকভাবে। বড় শহর-নগরেও অনেক ব্যবসায়ী পহেলা বৈশাখে (বাংলা সনের প্রথম দিন) 'হালখাতা' করে থাকেন। হালখাতা অর্থ হলো হিসাবের নতুন খাতা।

অনেকের ধারণা, পাশ্চাত্যসহ বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়েই বুঝি জুলাই-জুন অর্থবছর রাখা হয়েছে! বাস্তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যুক্তরাজ্যে অর্থবছর শুরু হয় ৬ এপ্রিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১ অক্টোবর শুরু হয় অর্থবছর। মার্কিন মুলুকের অন্যান্য দেশেও অক্টোবর-সেপ্টেম্বর অর্থবছর। আর পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের খুব কম দেশেই জুলাই থেকে অর্থবছর গণনা করা হয়। আমাদের প্রতিবেশি ভারত ও মিয়ানমারে অর্থবছর শুরু হয় ১ এপ্রিল। হংকং, জাপান ও সিঙ্গাপুরেও তাই। শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, চীন ও তাইওয়ানে অর্থবছর শুরু হয় ১ জানুয়ারি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা লাভের চার দশক পরও অর্থবছর গণনার ক্ষেত্রে আমরা পাকিস্তানি ধারায়ই রয়ে গেলাম। অথচ এপ্রিল কিংবা

বৈশাখ থেকে অর্থবছর শুরু করাটা আমাদের দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

মোগল সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের সেরা সুবা বাংলায় পহেলা বৈশাখ থেকে অর্থবর্ষ গণনার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন মূলত রাজস্ব আহরণ তথা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন সনের প্রবর্তন করেছিলেন দিল্লিতে। তখনই আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলা সন গণনা শুরু হয়েছিল। ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতিতে পরিচালিত ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম বাজেট আইন সভায় পেশ করা হয়েছিল ৭ এপ্রিল, ১৮৬০। অর্থবছরের ধারণাটা তখনো বাংলা সনের অনুগামী রাখার পক্ষপাতী ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম অর্থমন্ত্রী ও বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ জেমস উইলসন। এপ্রিল থেকেই তাঁর বাজেটটির বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল, যার সাযুজ্য ছিল প্রচলিত বাংলা সনের সঙ্গে। এর মাত্র তিন মাসের মাথায় ডিসেন্ট্রিতে ভুগে মারা যান জেমস উইলসন। পরবর্তী চার বছর বাজেট এপ্রিল-মে এমনকি জুন মাসে উপস্থাপিত হলেও ১৮৬৫ সাল থেকে স্থায়ীভাবে ১ এপ্রিল থেকে অর্থবছর শুরু করার বিধান কার্যকর হয়। ব্রিটিশ শাসন বাংলা-বিহার-ওড়িষা থেকে গোটা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হতে থাকলে বিশেষ করে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলে ব্রিটিশ ভাবধারায় অর্থবছর আলাদাভাবে গণনার রেওয়াজ চালু হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর নতুন ভারত প্রজাতন্ত্র ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ অর্থবছর অনুসরণে ফিরে গেলেও পাকিস্তান জুলাই-জুন অর্থবছর চালু রাখে। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি বা উৎপাদন মৌসুম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড—সব কিছুই ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিন্ন। সে কারণে জুলাই-জুন অর্থবছর সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।

দুঃখজনকভাবে পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত জুলাই-জুন এখনো বাংলাদেশের অর্থবছর হয়ে আছে। পাকিস্তানে বর্ষা শুরু হয় জুলাইয়ের মাঝামাঝি। শ্রাবণ ও ভাদ্র তাদের বর্ষাকাল। তাই জুলাই-জুন অর্থবছর হওয়া তাদের জন্য বরং সুবিধাজনক। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থবছরকে বাংলার প্রকৃতি-পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রতিফলক বাংলা সনের অনুগামী করার বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি।

পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের খুব কম দেশেই জুলাইয়ে অর্থবছর শুরু হয়। পাকিস্তানে বর্ষা শুরু হয় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে (শ্রাবণ ও ভাদ্র তাদের বর্ষাকাল)। অতএব ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন অর্থবছর হওয়া তাদের জন্য বরং সুবিধাজনক।

১৯৯০-পরবর্তী বছরগুলোতে অবশ্য অর্থনীতিতে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (১৯৮৪) তথ্যের বরাত দিয়ে বিশ্বব্যাংকের

১৯৮৫ সালের প্রকাশনায় স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন বছরে অর্জিত প্রবৃদ্ধি হারের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দেশে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.৪, ৩.১ ও ২.৬ শতাংশ। অথচ ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৪ শতাংশ। আর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০৮-এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যথাক্রমে ৬.৬৩, ৬.৪৩ ও ৬.২১ শতাংশ হারে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু জিডিপি ছিল যথাক্রমে ৭৩৪, ৭২৫, ৭৫১, ৭৪৭, ৭৫৪ ও ৭৫৭ টাকা (১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের স্থির দামের ভিত্তিতে)। অথচ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মাথাপিছু জিডিপি লক্ষ করা গেছে যথাক্রমে ২০৫১২, ২১৫৫০ ও ২২৫৯৭ টাকা (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির দাম অনুযায়ী)।

সারণি–১

১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত এক দশকে প্রাথমিক পণ্য ও শিল্প পণ্যখাত থেকে রপ্তানি আয়ের চিত্র

মিলিয়ন টাকা

অর্থবছর	প্রাথমিক পণ্য		শিল্প পণ্য		মোট অংকে
	অংকে	শতকরা	অংকে	শতকরা	
১৯৮৮-৮৯	৯৫৩৮.৮২১	২৩.২৮	৩১৪২৯.৫৭৭	৭৬.৭২	৪০৯৬৮.৩৯৮
১৯৮৯-৯০	১০৫৪৭.৮৪০	২১.১৯	৩৯২১৬.৩৭০	৭৮.৮১	৪৯৭৬৪.২১০
১৯৯০-৯১	১০৭৯৪.১৯২	১৭.৮২	৪৯৭৬৬.৬৮৯	৮২.১৮	৬০৫৬০.৮৮১
১৯৯১-৯২	১০২০৬.৭২৭	১৩.৪৫	৬৫৭০১.৮৩৯	৮৬.৫৫	৭৫৯০৮.৫৬৬
১৯৯২-৯৩	১২১৯৫.৩৩৬	১৩.১৭	৮০৩৮০.০৬৪	৮৬.৮৩	৯২৫৭৫.৪০০
১৯৯৩-৯৪	১৩৮১৯.৯৯১	১৩.৬৮	৮৭১৫৫.৯৫২	৮৬.৩২	১০০৯৭৫.৯৪৩
১৯৯৪-৯৫	১৮১৩৭.৩১৪	১৩.০২	১২১১৪৭.২৬৩	৮৬.৯৮	১৩৯২৮৪.৫৭৭
১৯৯৫-৯৬	১৯৪৬০.৬৬৬	১২.২৫	১৩৯৩৩০.২০৩	৮৭.৭৫	১৫৮৭৯০.৮৬৯
১৯৯৬-৯৭	২২৪১৫.০৫৬	১১.৯১	১৬৫৭১৫.৩৬৬	৮৮.০৯	১৮৮১৩০.৪২২
১৯৯৭-৯৮	২২৭৭১.৯৬৯	৯.৭২	২১১৩৯১.৭৯০	৯০.২৮	২৩৪১৬৩.৭৫০

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

অর্থনীতির এ অগ্রগতি মূলত শিল্পখাত বিকাশের ফসল। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর

তথ্য অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে যেখানে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫টি, সেখানে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৪টিতে। বাংলাদেশ এখনো শিল্পে অনগ্রসর হলেও দেখা যায় যে, রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে শিল্পপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে। বাকি ১০ শতাংশের মতো আসে প্রাথমিক পণ্য (Primary Commodities) রপ্তানি থেকে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬.৭২ শতাংশ অর্জিত হয়েছিল শিল্পপণ্য থেকে, আর ২৩.২৮ শতাংশ এসেছিল প্রাথমিক পণ্য থেকে। অথচ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয় মাত্র ৯.৭২ শতাংশ।

শিল্পখাতে রপ্তানিযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মধ্যে আছে তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। আর প্রাথমিক পণ্য হলো কাচা পাট, চা, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করে অর্জিত হয় মোট রপ্তানি আয়ের ৮২.২২ শতাংশ। আর হিমায়িত খাদ্য, পাট ও চা রপ্তানি থেকে আসে মাত্র ৫.৫০ শতাংশ। এ চিত্র থেকেই দেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান স্পষ্ট বোঝা যায়।

তবে শিল্পের এ বিকাশের জন্য আমাদেরকে মূল্যও দিতে হচ্ছে অনেক। একদিকে শিল্প বিকাশের স্বার্থে অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে পরিবেশের দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়েই। অন্যদিকে শিল্প-কারখানা থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থ পরিবেশের উপাদানগুলোকে (মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদি) মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। শিল্প-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া তো বাতাসকে দূষিত করছেই; পাশাপাশি শিল্পবর্জ্য মাটির রাসায়নিক সংযুতি ভেঙে দিয়ে ফসফরাস, নাইট্রোজেন, সালফার প্রভৃতি উপাদানকে ফিরে আসতে সাহায্য করছে বাতাসে। এক গবেষণায় (Rahman, 1999) দেখা যায়, শিল্প এলাকায় বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_X), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও ভাসমান বস্তুকণার (SPM) ঘনত্ব পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারণ করা মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। যেমন সালফার ডাই-অক্সাইডের ডিওই নির্ধারিত মাত্রা ১২০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার হলেও ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এর ঘনত্ব লক্ষ করা যায় ২৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার। অর্থাৎ নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে এটি ১.৯৬ গুণ বেশি। একইভাবে ওই এলাকায় নাইট্রোজেন অক্সাইডের ঘনত্ব পাওয়া যায় ১৩৯ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার, যা নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে ১.৩৯ গুণ বেশি। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব পাওয়া যায় ৫৬৬ পিপিএম। এটি স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭৭ গুণ বেশি। ভাসমান বস্তুকণার ঘনত্ব লক্ষ করা যায় ৭০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার, যা

স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪০ গুণ বেশি। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের এই চিত্রের জন্য প্রধানত দায়ী করা হয় ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনকে।

সারণি–২

পরিবহনজনিত পরিবেশ দূষণ (বায়ু) ১৯৯৮

স্থান	বায়ু দূষকের ঘনত্ব*				DOE নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য সীমা			
	SO_2 (ug/m^3)	NO_X (ppm)	SPM (ug/m^3)	CO_2 (ppm)	SO_2 (ug/m^3)	NO_X (ppm)	SPM (ug/m^3)	CO_2 (ppm)
শাহবাগ	২২৭	১২৯	৮৯৮	৪৪৯	৩০	৩০	১০০	৩২০
সদরঘাট	২২৯	১৪৭	৫৬৬	৫০২	১০০	১০০	৪০০	৩২০
মহাখালী	২৩৮	১৩৭	৭৯৪	৪৯৮	১০০	১০০	৪০০	৩২০
মগবাজার	২৩০	১৩৭	৯৩৭	৪৭৯	১০০	১০০	৪০০	৩২০
মতিঝিল	২৩৪	১৪১	১০০১	৪৮০	১২০	১০০	৫০০	৩২০
সায়দাবাদ	২৩৫	১৪৪	১০১৭	৪৯২	১২০	১০০	৫০০	৩২০
নিউমার্কেট	২২৬	১২১	৬৫২	৪৮৬	১২০	১০০	৫০০	৩২০
ফার্মগেট	২৩৫	১৩৭	১০৭৬	৪৯১	১২০	১০০	৫০০	৩২০
গাবতলী	২৪২	১৫৩	১০২৩	৪৯৩	১২০	১০০	৫০০	৩২০

উৎস : Rahman, 1999

*লেখকের সংগৃহীত মাঠ পর্যায়ের তথ্য থেকে হিসাব করা

একই গবেষণায় দেখা যায়, শিল্পবর্জ্য মেশার ফলে ভূ-উপরিস্থিত পানিতে সীসার পরিমাণ ১.৫ থেকে ২.০ গুণ, লোহার পরিমাণ ১.৭৫ গুণ এবং দস্তা, ক্যাডিয়ামসহ অন্যান্য ভারী ধাতুর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। শিল্পবর্জ্য মিশ্রিত পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় মাছসহ জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের বিনাশ ঘটে। এর পরিণাম হিসেবে

মানুষের পুষ্টি ঘাটতিসহ সামগ্রিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। অর্থনীতিতেও দেখা দেয় নেতিবাচক প্রভাব।

উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত পরিবহন তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে নৌপরিবহন ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবহেলা ও সঙ্কুচিত করে সড়ক পরিবহনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় যানবাহনের ধোঁয়ায় বায়ুদূষণসহ সামগ্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর যেসব এলাকায় যান চলাচল বেশি সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শাহবাগ, মহাখালী, সদরঘাট, মগবাজার, মতিঝিল, সায়দাবাদ, নিউমার্কেট, ফার্মগেট ও গাবতলী। রহমানের ওই গবেষণায় দেখা গেছে, শাহবাগ এলাকার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও ভাসমান বস্তুকণার ঘনত্ব যথাক্রমে ২২৭, ১২৯ ও ৮৯৮ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার; যা ডিওই নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে যথাক্রমে ৭.৫, ৪.৩ ও ৮.৯ গুণ বেশি। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বও ন্যাশনাল এমিশন্স স্ট্যান্ডার্ড স্টাডিজ (NESS) নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে ১.৪ গুণ বেশি। অন্যান্য স্থানেও একই রকম চিত্র পাওয়া যায়।

অথচ নৌপরিবহন ও রেল যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিলে পরিবেশের ক্ষতি অনেক কম হতো। উপকার হতো অর্থনীতির। কেননা এ দুটি যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী। এতে ভূমির অপচয় হয় না। দুর্ঘটনাও ঘটে কম। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ফলে এখানে টেকসই উন্নয়নের জন্য সেচ, পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও মৎস্য সম্পদ–এসব বিচেনায় নিয়ে নৌপথ বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। নৌপথ বিকাশের লক্ষে নদী খনন করা হলে মৎস্য সম্পদ বাড়ার পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার বাড়বে। কমবে বন্যায় ফসলহানি ও অবকাঠামোগত ক্ষতির ঝুঁকি।

একসঙ্গে বেশি যাত্রী ও মালপত্র পরিবহনের সুবিধা, যানযট সমস্যা না থাকা, ভূমির পরিমিত ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয়, কম পরিবেশ দূষণ ও নিরাপদ যাতায়াত সুবিধার কারণে দেশে দেশে রেল যোগাযোগের গুরুত্ব বেড়েছে। অথচ আমাদের দেশে এ খাতটি চরমভাবে অবহেলিত। ১৯৪৭ সালে এ দেশে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ছিল ২ হাজার ৮০০ কিলোমিটার। ২০০৫ সাল নাগাদ তা সঙ্কুচিত হয়ে নেমে আসে ২ হাজার ৭০০ কিলোমিটারে। সম্প্রতি পার্বতীপুর থেকে মধ্যপাড়া কঠিনশিলা ও বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পর্যন্ত এবং যমুনা সেতু রেল লিঙ্ক প্রকল্পের অওতায় জামতৈল থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের ফলে রেলপথের দৈর্ঘ্য কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮৪৮ কিলোমিটার। অথচ পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৯৪৭ সালের ৬০০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ২০০৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৯ হাজার ৫০০ কিলোমিটারে।

একটি মিটার গেজ মালবাহী ট্রেন ২১০টি ট্রাকের (৫ টনি) সমপরিমাণ সামগ্রী পরিবহন করতে পারে। ডাব্লিউবিবি ট্রান্সের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ট্রেনের চেয়ে গাড়ি (car) ৮.৩ গুণ এবং ট্রাক ৩০ গুণ বেশি পরিবেশ দূষণ করে। অন্যদিকে ট্রেনের চেয়ে গাড়ি ও ট্রাকের জ্বালানি খরচ যথাক্রমে ৩.৫ ও ৮.৭ গুণ বেশি। সবারই জানা যে, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। বাংলাদেশে যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আছে তা দিয়ে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলতে পারে। এমনিতেই আমরা জ্বালানির জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক গ্যাস ফুরিয়ে গেলে এ নির্ভরতা আরো বাড়বে।

গোটা বিশ্বেই পানি সংকট তীব্র হচ্ছে দিন দিন। পৃথিবীর ২০০ কোটি মানুষের পানি সংকটের প্রেক্ষাপটেই ২০০৩ সালকে 'আন্তর্জাতিক মিঠাপানি বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছিল জাতিসংঘ। সে বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবশের মূল প্রতিপাদ্যও ছিল পানি। অন্যান্য দেশে যা-ই হোক না কেন নদীমাতৃক বাংলাদেশে তীব্র পানি সংকট দেখা দেবে এটা কি ভাবা যায়? কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০০৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসেই (৫ জুন) প্রথম আলোয় লাল রঙে শিরোনাম ছাপা হয় 'পানি সংকটে ৩ কোটি মানুষ'। পরদিন (৬ জুন) একই পত্রিকায় 'নদীমাতৃক দেশে পানিসংকট' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "পানির এই সংকটের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে দেশের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল জুড়ে ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক দূষণ, পুকুর, দিঘি, খাল, বিল, নদীসহ ভূপৃষ্ঠের মিঠাপানির প্রাকৃতিক আধারগুলোর নানা রকম সংকোচন ও দূষণ। এগুলোর অধিকাংশই মানবসৃষ্ট কারণ। কৃষিকাজে গভীর নলকূপের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে দিঘি-পুকুর-খালগুলো পানিশূন্য হয়ে পড়ে। তা ছাড়া সারা দেশে ছোট-বড় মিলে ২৪০টি নদীর মধ্যে ১০০টিরও বেশি নদী এখন শুকিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। পানিশূন্য নদীগর্ভকে চাষাবাদের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। করতোয়া ও বড়ালের মতো ঐতিহ্যবাহী নদীগুলোসহ অনেক শাখানদী স্থানবিশেষে ফসলের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। নদীদখল ও নদীর পানি দূষণও চলছে লাগামহীন মাত্রায়, বিশেষত শহরাঞ্চলে। এমনিতে প্রাকৃতিক কারণে নদীগর্ভে পলি জমে নদীর নাব্যতা কমে যায়, সেই সঙ্গে মানুষের দখলবাজি যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো এখন সত্যিই বিপন্ন। দেশের নদীগুলোতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩ কোটি টন পলি-বালি জমে। এ জন্য প্রতি বছর ৫১৮ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং দরকার। কিন্তু প্রয়োজনের মাত্র ১৫ শতাংশ ড্রেজিং করা হয়। আর নদীর পানি দূষণের কথা বলাই বাহুল্য। বুড়িগঙ্গার পানির দূষণ এতটাই ঘটেছে যে, এই জলধারা বস্তুত এখন একটি নর্দমা, যা মাঝে মাঝে কেবল পচা দুর্গন্ধই ছড়ায় না, 'ওষুধের গন্ধ'ও ছড়ায়। অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা ঢাকা শহরের নানা

রকম বর্জ্যের সঙ্গে শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য নিক্ষেপেরও জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বুড়িগঙ্গার তীরে বসবাসকারী গরিব মানুষদের তাই 'ভাতের চেয়েও পানির কষ্ট বেশি'। নদীদূষণ শুধু বুড়িগঙ্গাতেই সীমাবদ্ধ নেই। ছোট-বড় যেকোনো শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রায় সব নদীই নানা মাত্রায় দূষণের শিকার। এমনকি মেঘনার মতো নদীও দূষণের বাইরে নেই।"

পলি জমে নদী ভরাট এবং দখলের ফলে দেশের অনেক নদী মরে যেতে বসায় কেবল মানুষের পানি সংকটই বাড়ছে না, প্রায় প্রতি বছরই অকাল ও মৌসুমী বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপক। ২০০৭ সালের বন্যায় দেশে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছিল ২,৩০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া মৎস্যসম্পদ ও গবাদিপশুর ক্ষতি হয় যথাক্রমে ১৯৮ কোটি ও ১৬ কোটি টাকার। কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর ক্ষতির এ পরিমাণ নিরূপণ করে বলে সে বছরের ৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। কোনা কোনো হিসাব অনুযায়ী সে বছরের বন্যায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩,০০০ কোটি থেকে ৫,০০০ কোটি টাকা। ২০০৪ সালের বন্যায়ও দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডাব্লিউএফপি) হিসাব অনুযায়ী, ওই বন্যায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪২,০০০ কোটি টাকা। বিআইডিএসের গবেষণা অনুযায়ী ১৯৯৮ সালের বন্যায় অবকাঠামো খাতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৯৪৯ কোটি টাকা। শিল্প ও কৃষিখাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছিল যথাক্রমে ১,২২৭.২২ কোটি ও ৫,০৫২ কোটি টাকা। অর্থাৎ সে বছর বন্যায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১০,২২৮.২২ কোটি টাকা, যা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৭ শতাংশের সমান। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই এসব ঘটছে। নিয়মিত নদনদী খনন ও জলাধার সংরক্ষণ করা গেলে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। নদী খনন ছাড়া পাহাড়ি ঢলের হাত থেকে হাওর এলাকার বোরো ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার এবং কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটি ও পানির ব্যাপক দূষণসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের (বাতাস, পাখি, উপকারী কীটপতঙ্গ ইত্যাদি) ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে ফসলের ফলন বাড়লেও মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বর্ষার পানিতে মিশে নদী ও খালে পড়ে পানিকে দূষিত করছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে মাছের। এটা অর্থনৈতিক ক্ষতিও বটে।

সাময়িক লাভ দেখে মানুষ উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠছে। পরিবেশের কথা না ভেবে ক্রমবর্ধমান হারে চিংড়ি চাষ করার ফলে ওইসব এলাকায় লবণাক্ততা বেড়ে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে কমছে পশুখাদ্যের প্রাপ্যতা। এতে সামগ্রিকভাবে হুমকির মুখে পড়ছে জীবজগত। কয়েক বছর আগের এক জরিপে দেখা যায়, লবণাক্ততার কারণে ওই সময় পর্যন্ত ২ লাখ একর জমি উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলে অনেকাংশে।

অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তাসহ নানা অবকাঠামো এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অপর্যাপ্ত স্লুইস গেট নির্মাণের কারণে দেশের অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। বিলডাকাতিয়া ও ভবদহ এর বড় নজির। জলাবদ্ধতার কারণে হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি, ক্ষেত-খামার ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বছরব্যাপী জলাবদ্ধতায় ৯৭ হাজার ৭৭১ হেক্টর এবং আমন মৌসুমে জলাবদ্ধতায় ৪১ হাজার ৪৭৩ হেক্টর কৃষি-জমি কমে গেছে। ফলে বছরে ৬ লাখ টন ধান কম উৎপাদিত হচ্ছে। অর্থনীতির জন্য এটি এক বিপর্যয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পরিবেশকে বিবেচনায় না নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাতে গেলে এক পর্যায়ে তা অনুন্নয়নই ডেকে আনে।

পরিবেশ দূষণেরই পরিণাম জলবায়ু পরিবর্তন। এ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যদিও বাংলাদেশের ভূমিকা নগণ্য, কিন্তু খেসারত দিতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতিসংঘ প্যানেল আইপিসিসির হিসাব অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হলে ১০০ বছর ধরে ব্যয় করতে হবে ১২০ কোটি ডলার। পরিবেশের কথা না ভেবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাতে গেলে অর্থনীতির কতটা ক্ষতি হয় তা এ তথ্য থেকেই বোঝা যায়।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, অষ্টাদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৭
২. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ষোড়শ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৫
৩. নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০৮
৫. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ওয়েবসাইট

অপার সম্ভাবনার হাওর অবহেলায় বিপর্যস্ত

হাওর হলো বিশাল বাটি বা গামলা আকৃতির ভূ-গাঠনিক অবনমন বা নোয়ানো অবস্থা। হাওর শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'সাগর'-এর বিকৃত রূপ বলে ধারণা করা হয়। বর্ষাকালে হাওরে পানিরাশির ব্যাপ্তি এত বেশি থাকে যে দেখে মনে হয় তীরহীন সমুদ্র। প্রধানত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাওর দেখা যায়। এই হাওরগুলো নদী ও খালের মাধ্যমে জলপ্রবাহ পেয়ে থাকে। শীতকালে হাওরগুলো বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে রূপ নেয়। জেগে ওঠা উর্বর জমিতে শুরু হয় ফসলের আবাদ। গরু-মহিষের পাল ঘুরে বেড়ায় বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে। ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পানিসম্পদমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে হাওর এলাকার সংসদ সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে বলা হয়, দেশের ৪১১টি হাওরের মধ্যে ৪৬টি থেকেই বছরে ৭০০ কোটি টাকার ফসল উৎপাদন সম্ভব। আর সবকটি হাওরকে উন্নয়নের আওতায় আনা গেলে শুধু হাওরাঞ্চল থেকে উৎপাদিত ফসল দিয়েই সারা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চাল রপ্তানি করা যেতে পারে। (সূত্র : সংবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭)

একসময় মেঘনা ও এর শাখানদীগুলো দ্বারা গঠিত প্লাবনভূমির স্থায়ী ও মৌসুমি হ্রদ নিয়েই গঠিত হয়েছিল হাওর অববাহিকা, যেখানে প্রচুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ থাকত। কিন্তু ধারাবাহিক অবক্ষেপণের কারণে অববাহিকাগুলোর গভীরতা কমে গিয়ে চরা জেগে সেখানে হোগলা ও নলখাগড়ার ঝোপ গজিয়ে ওঠে। এর ফলে একদিকে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির খাদ্য ও আশ্রয়ের আদর্শ স্থান হয়ে ওঠে হাওর অঞ্চলগুলো, অন্যদিকে যাযাবর পাখিদের আকর্ষণীয় আবাসস্থলে পরিণত হয়। আবার যাযাবর পাখিদের মলমূত্রে সমৃদ্ধ হয়ে উর্বর জলমহালগুলো Phytoplankton (উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন) ও দীর্ঘ লতাগুল্মের জন্ম দেয়, যা ইউট্রোফিকেশন (পানির নিচে প্রচুর উদ্ভিদ জন্মানো) প্রক্রিয়াকে অংশত সাহায্য করছে।

অববাহিকাটি উত্তরে মেঘালয় পর্বতমালা (ভারত), দক্ষিণে ত্রিপুরার পাহাড় (ভারত) এবং পুবদিকে মণিপুরের (ভারত) উচ্চভূমি দিয়ে ঘেরা। বিশাল এই পলিগঠিত সমভূমিতে ছয় হাজারের বেশি স্থায়ী অগভীর জলমহাল আছে, যেগুলো বিল নামে পরিচিত।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অসংখ্য পাহাড়ি নদী এই পলিভূমিতে প্রচুর পানি সরবরাহ করে। বর্ষাকালে ৬ মিটার পর্যন্ত গভীর বন্যার পানিতে তলিয়ে থাকে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শুকনো মৌসুমে অধিকাংশ পানি সরে যায়। দু-একটি বিলের অগভীর পানিতে গজিয়ে ওঠে প্রচুর পরিমাণ বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ। টানা খরা মৌসুমের শেষ দিকে পানি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে অতি উর্বর পলিমাটির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ব্যাপক ধান চাষের তোড়জোড় চলে। এই অববাহিকায় রয়েছে প্রায় ৪৭টি বড় হাওর এবং বিভিন্ন মাপের প্রায় ৬ হাজার ৩০০ বিল। এগুলোর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্থায়ী এবং ২ হাজার ৮০০ অস্থায়ী বা ঋতুভিত্তিক বিল।

সুরমা, কুশিয়ারার পাশাপাশি অন্যান্য ছোটখাট পাহাড়ি নদনদী, যেমন–মনু, ধনু, কংস, খোয়াই, যাদুকাটা, পিয়ান, বৌলাই, মগরা প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে হাওরের ঘন জলনির্গম প্রণালীর সঙ্গে। হাওরের সঙ্গে সংযুক্ত সমভূমির বাকি অংশ বন্যায় প্লাবিত হয় প্রায় সাত থেকে আট মাসের জন্য। বর্ষাকালে হাওরগুলো পরিবর্তিত হয় বিশাল অন্তর্দেশীয় সমুদ্রে, যার ফলে গ্রামগুলোকে দেখা যায় দ্বীপের মতো। কখনো কখনো জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জোরে বাতাস থেকে উৎপন্ন হয় বিশাল ঢেউয়ের পর ঢেউ, যা বসতবাড়ির জন্য ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পুরো সুনামগঞ্জ জেলা, হবিগঞ্জ জেলার বড় অংশ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৌলভীবাজার জেলার অংশবিশেষসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার বড় অংশ হাওর দিয়ে বেষ্টিত। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ হাওরগুলো হলো–শনির হাওর, হাইল হাওর, হাকালুকি হাওর, ডাকের হাওর, মাকার হাওর, ছাইয়ার হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, কর্চার হাওর, চন্দ্র সোনারতাল এবং কাওয়া দীঘি হাওর। বৃহত্তর ময়মনসিংহের উল্লেখযোগ্য হাওরগুলো হলো–ডিঙ্গাপোতা, নাওটানা, চর হাইজদিয়া, লক্ষ্মীপাশা, কীর্তনখোলা, লক্ষ্মীপুর, গোবিন্দডোবা, চাকুয়ার হাওর, জোয়ানশাহী।

হাওরগুলোকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উৎপাদনশীল জলাভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যাপক জীববৈচিত্র্য ধারণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে হাওরের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী ও পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে হাওরগুলো সুপরিচিত। বন্যার পানি চলে যাওয়ার পর হাওরে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার ছোট-বড় মাছ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। সেইসঙ্গে জেগে ওঠে পশুচারণভূমি। হাওর এলাকা অতিথি পাখিদের সাময়িক বিশ্রামক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বিচিত্র ধরনের জলজ পাখিসহ অসংখ্য হাঁসের আবাসস্থল ছাড়াও বহু বন্য প্রাণির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল এইসব হাওর। এই জলাভূমির বনাঞ্চলে একসময় জলসহিষ্ণু উদ্ভিদ, যেমন–হিজল (*Barringtonia acutangula*),

করচ (*Ponogamia pinnata*), বরুণ (*Crataeva nurvala*), ভুই ডুমুর (*Ficus heterophyllus*), জলডুমুর (এক ধরনের Ficus), হোগলা (*Typha elephantina*) নল (*Arundo donax*), খাগড়া (*Pharagmites karka*), বনতুলসী (*Ocimum americanum*), বলুয়া প্রভৃতি জন্মাত প্রচুর পরিমাণে।

জীববৈচিত্র্যের এই পৃথিবীতে জলাভূমি হলো সবচেয়ে উর্বর। একটি গম ক্ষেতের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ বেশি সবুজ উদ্ভিদ জন্মায় জলাভূমিতে। বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ মাছের জোগানও আসে হাওর-বাঁওর-বিল জাতীয় জলাভূমি থেকে। পানির প্রাকৃতিকচক্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও জলাভূমি। পানির দূষণ এবং দ্রবীভূত পলি মুক্ত করতে, উদ্ভিদ জন্মাতে মিঠা পানির সরবরাহচক্রে জলাভূমির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হাওরাঞ্চলকে ভাটি এলাকাও বলা হয়। ইতিহাস-ঐতিহ্যে বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসেবে পরিচিত এই এলাকা। বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তেরো শতকের মাঝামাঝি আসামের কামরূপ থেকে নদীপথে এসেছিলেন হবিগঞ্জে। সেখান থেকে ভাটি এলাকার ওপর দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছিলেন সোনারগাঁয়। ওই ভ্রমণের সময় ভাটি এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করেছিল। বজরাসহ পাল তোলা হরেক রকমের নৌকা, নদীতীরের গ্রাম-গঞ্জ, হাটবাজার, গাছপালা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেছিলেন এ অঞ্চলের নিসর্গের।

এককালে এ অঞ্চলের হাওর ও নদী থেকে তোলা উৎকৃষ্ট মুক্তা রপ্তানি হতো সুদূর ইউরোপে। এখানকার ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদির খ্যাতি ছিল ভারতবর্ষজুড়ে। রপ্তানিও হতো এসব নানা দেশে। হাওরাঞ্চলের মিঠা পানির মাছের মতো এমন সুস্বাদু মাছ অন্য কোনো দেশে পাওয়া কঠিন।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে হাওরগুলো হুমকির সম্মুখীন। মাটিভরাট করে হাওরে গড়ে উঠছে বসতবাড়ি, হাওরের প্রান্তিকভূমিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে বোরো চাষ, কেটে ফেলা হচ্ছে হাওরের বৃক্ষরাজি, সেইসঙ্গে বিলুপ্তি ঘটছে প্রাণিজগতের।

সুনামগঞ্জ জেলা মৎস্য অফিস সূত্রের বরাত দিয়ে ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭০ সালের আগেই জেলায় মাছের বার্ষিক উৎপাদন ছিল গড়ে এক লাখ টনের বেশি। ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদন ছিল ৯৫ হাজার টন। ১৯৯০-৯১ সালে তা নেমে আসে ৪০ হাজার টনে। ১৯৯১-৯২ সালে তা আরো কমে দাঁড়ায় ৩৫ হাজার টনে। প্রতিবেদনে জেলায় মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার জন্য পলি জমে হাওর ও নদী ভরাট হওয়া এবং ইজারার শর্ত উপেক্ষা করে বিল শুকিয়ে ইজারাদারদের

মাছ ধরাকে দায়ী করা হয়।

সমস্যা জর্জরিত এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের নানা সমস্যার কথা সংবাদ মাধ্যমে কিংবা উপন্যাস, নাটক, সিনেমায় কোনো না কোনোভাবে উঠে এলেও হাওরবাসীর জীবন-জীবিকা ও সমস্যার কাহিনী দীর্ঘকাল ছিল দেশের মানুষের অজানা। দেরিতে হলেও ইদানীং এ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে কিছু। সংবাদ মাধ্যমেও উঠে আসছে নানা বিষয়। দেশে তো বটেই, এমনকি বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সালে বোরোর বাম্পার ফলন দেশবাসীর জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক ছিল। আর এ প্রেক্ষাপটেই হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন ইস্যুটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সামনে আসে। সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া—এ সাত জেলার ৪৮টি উপজেলার ২০ হাজার ২২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ২ হাজার ৪১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে হাওর অঞ্চল। বছরের অর্ধেক সময় হাওরগুলো বহমান পানিতে ডুবে থাকায় জমিতে পলি জমে তা হয়ে ওঠে উর্বর। শুকনো মৌসুমে সেচসুবিধা নিশ্চিত করাসহ পরিকল্পিত উপায়ে চাষ করতে পারলে এবং বৈশাখে আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা গেলে এ অঞ্চল থেকে শুধু একটি ফসলের মাধ্যমেই যে-পরিমাণ চাল উৎপাদন করা সম্ভব, তা দিয়ে গোটা দেশের খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে উৎপাদন করা যেতে পারে বিপুল পরিমাণ মাছ, যা দিয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়েও বছরে কয়েক শ কোটি টাকার মাছ রপ্তানি করা সম্ভব। মুক্তাসহ ঝিনুক চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা না-ই বা বললাম। যথাযথ পরিকল্পনা নিয়ে এগুলে পর্যটন এলাকা হিসেবেও এ অঞ্চল হয়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ।

ধান ও মাছ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনাময় হাওর অঞ্চলের দিকে এতকাল নজরই পড়েনি জাতীয় নীতিনির্ধারকদের। নজর যেটুকু পড়েছে তা শুধু হাওরে বেড়িবাঁধ নির্মাণের দিকেই। প্রতি বছর কয়েক শ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় হাওরে বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য; কিন্তু তাতে কাজের কাজ তেমন হয়নি। আসলে পাহাড়ি ঢল বা আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল রক্ষার কৌশলটি আমাদের জাতীয় উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কিত। গত কয়েক দশকে সব সরকারই মূলত আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর পরামর্শে (যা নির্দেশের চেয়ে কম নয়) রেল ও নৌপথকে উপেক্ষা করে সড়ক যোগাযোগের দিকে যেমন মনোযোগ দিয়েছে, তেমনি বন্যা মোকাবিলায়ও গুরুত্ব দিয়েছে বাঁধ নির্মাণ তথা 'ঘেরাও' পদ্ধতির ওপর। বর্তমানে এই যে খাদ্য সংকট, এটি মূলত পরিবেশ বিপর্যয় এবং আমদানিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই পরিণাম। বিশ্বের সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের দেশের ভূমিকা তেমন

উল্লেখযোগ্য না হলেও সামান্য বৃষ্টিপাতে জলাবদ্ধতা ও বন্যা এবং পাহাড়ি ঢলে হাওরের ফসলহানি রোধ করতে না পারাটা আমাদের 'ঘেরাও' দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতারই ফল। খাদ্য নিরাপত্তার মারাত্মক ঝুঁকির মুখে বর্তমানে যখন কৃষিখাতের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে, তখন আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গিটিও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

দেশের নদ-নদী ও জলাশয় ব্যাপক হারে ভরাট হওয়া এবং শুকিয়ে যাওয়ায় ফসল ও মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সেই সঙ্গে হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য। এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের অর্থনীতিও অচিরেই প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়বে। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্ট্যাডিজের নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান ২০০৮ সালে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'কৃষি ও মৎস্য খাতে নদী ধ্বংসের সরাসরি প্রভাব পড়ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বছরে ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার মৎস্য কম উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে দূষণের কারণে কম হচ্ছে ২ হাজার কোটি টাকা। আর শুকিয়ে যাওয়ার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকা।' কোনো গবেষণা ছাড়া সাদা চোখেই দেখা যায়, নদী শুকিয়ে গেলে অববাহিকা অঞ্চলের মাটিও শুকিয়ে যায়। আর নদী-নালা শুকিয়ে যাওয়ায় সেচের জন্য নির্ভর করতে হয় ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর। তাতে খরচও পড়ে বেশি। এছাড়া ক্রমাগতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে নতুন বিপর্যয় নেমে আসে পরিবেশের ওপর। কাজেই আমাদের কৃষি অর্থনীতি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য নদ-নদী রক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অনেক বিশেষজ্ঞও এর সঙ্গে একমত। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সারফেস ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শওকত আলী ২০০৮ সালের ৮ মার্চ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'উজানের নদীগুলোর পানির প্রবাহ বাড়াতে হবে। খনন বা পুনঃখনন করে প্রবাহ বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে ছোট ছোট নদীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বড় নদীগুলোর খনন এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।'

নদী খননের কথা উঠলেই আমাদের নীতিনির্ধারকরা দশকের পর দশক একে ব্যয়বহুল আখ্যা দিয়ে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। অথচ এটা না করায় খননজনিত খরচের চেয়ে কত বেশি লোকসান বা ক্ষতি হচ্ছে সে হিসাব খতিয়ে দেখার চেষ্টাও তারা করেননি। বেসরকারি সংস্থা সিএনআরএসের এক সমীক্ষায় বলা হয়, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরে শুধু সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে আগাম বন্যায় বোরো ফসলের ক্ষতি হয়েছে ৫৮৭ কোটি ১২ লাখ ১৮ হাজার টাকার। অন্যান্য সূত্রের হিসাবে অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ অনেক

বেশি। ২০০৪ সালের মে মাসে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহায়তায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ'-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ওই বছর এপ্রিলে পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে সুনামগঞ্জে বোরো ফসলের ক্ষতি হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকার। প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০০ সালের এপ্রিলের বন্যায় ওই জেলায় ফসলডুবিতে বেসরকারি হিসাবে ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল। অবশ্য সরকারি হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭০ কোটি টাকা। পাহাড়ি ঢলে প্রায় বছরই বোরো ফসলের একই রকম ক্ষতি হয়ে থাকে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওরাঞ্চলেও। কাজেই ক্ষতির পরিমাণ যে বছরে কয়েক শ কোটি টাকার কম নয় তা বলাই বাহুল্য।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২০১০ সালের বোরো মৌসুমে হাওর ও চরাঞ্চলের প্রায় তিন লাখ হেক্টর জমির আধাপাকা বোরো ধান পানিতে তলিয়ে যায় দুই সপ্তাহে। ক্ষতির পরিমাণ ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি। সংশ্লিষ্ট কৃষকদের অভিযোগ, ২০০৮ সালে বড় ধরনের বন্যার পর ভেঙে পড়া বাঁধের সংস্কার এবং নতুন করে বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় সেবার সামান্য পাহাড়ি ঢল গ্রাস করেছে বোরো ফসল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনিটরিং বিভাগ সূত্রের বরাত দিয়ে ৩ মে ২০১০ তারিখে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২ মে পর্যন্ত দেশের হাওর ও চরাঞ্চলের আট জেলার (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও জামালপুর) প্রায় দুই লাখ হেক্টর জমির ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। তবে মাঠপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের দাবি, সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া বোরো ফসলের জমির পরিমাণ তিন লাখ হেক্টরেরও বেশি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা জানান, প্রতি হেক্টরে ৩ দশমিক ৮৯ মেট্রিকটন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরলে এবার উৎপাদন কমবে প্রায় ১১ লাখ ৬৭ হাজার টন। সর্বশেষ বাজারদর অনুযায়ী (২৭ টাকা কেজি) ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩,১৫০ কোটি ৯০ লাখ টাকা। সেবার সারা দেশে ৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ এবং এক কোটি ৯০ লাখ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সে বছরের ২ মে পর্যন্ত কাটা হয় প্রায় ৩৫ শতাংশ জমির ধান।

২০১০ সালে এপ্রিলের শুরুতেই অর্থাৎ মধ্য চৈত্রে হাওরে বাঁধ ভেঙে ফসল তলিয়েছিল। সে সময় এক নিবন্ধে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার তখনকার ভাইস চেয়ারম্যান শামিমা শাহরিয়ার লিখেছিলেন, 'প্রথম যখন পাহাড়ি ঢল

নেমে কিছু কিছু হাওরের বাঁধ ভেঙে যায়, তখন অন্য সবার মতো আমরাও পাউবোর কর্মকর্তার দুর্নীতিকেই বড় করে দেখেছিলাম। কারণ প্রতিবছর একই বাঁধ বারবার বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে এনে হাওরবাসীর সঙ্গে পাউবো চোর-পুলিশ খেলা করে। যেমন—যদি বন্যা হয়, তাহলে কেউ খবর রাখে না কোন কোন প্রকল্পে কাজ হলো কি হলো না। জনগণের অভিমত হলো, অবশ্যই দুর্নীতি হয়েছে বাঁধ নির্মাণে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, শতভাগ কাজ হলেও এ বছর বাঁধ উপচে পানি আসতই। কারণ হাওরপাড়ের সব নদী নাব্যতা হারিয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে যখনই আগাম বন্যা বা পাহাড়ি ঢলে হাওরে বাঁধ ভেঙে বা উপচে ফসলহানি ঘটে তখনই শুরু হয় পাউবোর বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আর বাঁধ সংস্কারে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি নিয়ে শোরগোল। সেই শোরগোলের আড়ালে থেকে যায় নদনদী খননের দাবিটি।

২০১০ সালে যে সময়ে যে মাত্রায় পাহাড়ি ঢল এসেছে, সে রকমটি আগে কখনো হয়নি। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। এ ছাড়া হাওরাঞ্চলে এ পর্যন্ত নদী খনন করা হয়নি। নদীগুলো এতটাই ভরাট হয়ে গেছে যে বেড়িবাঁধ উঁচু করেও এত পানির চাপ সামলানো সম্ভব নয়। সরকারকে সুরমা, ধনু, কংস ও কুশিয়ারা নদী খননের জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে হাওরের ফসল রক্ষা করতে হলে। ২০০৮ সালের বন্যার পর ভেঙে যাওয়া নদীর পাড় শক্তভাবে মেরামত করার উদ্যোগ পরবর্তী দেড় বছরেও নেওয়া হয়নি। এ ছাড়া হাওরের ডুবো বাঁধও নতুন করে নির্মাণ করা হয়নি। সামান্য যা করা হয়েছে সেগুলোতেও দেওয়া হয়নি পর্যাপ্ত উপকরণ। ফলে নিম্নমানের ওই সব বাঁধ পানির চাপে ভেঙে গেছে। ডুবে গেছে হাজার হাজার হেক্টর জমির ধান। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ও কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. জহুরুল করিম সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'এবার (২০১০ সালে) অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকটাই আগাম হানা দিয়েছে পাহাড়ি ঢল। ঘরে তোলার প্রাক্কালে এ ধরনের ঢলে ধানের পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে।'

২০১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর বার্তা সংস্থা ইউএনবির এক খবরে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অকাল বন্যায় আগামী বছরগুলোতে হাওরাঞ্চলের বোরো উৎপাদন আশঙ্কাজনক মাত্রায় কমে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বড় ধরনের খাদ্য সংকটে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এ জন্য দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর রক্ষাবাঁধগুলোর উচ্চতা বাড়ানো এবং নদী খননের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংয়ের (আইডাব্লিউএম) নির্বাহী পরিচালক এমদাদ উদ্দিন আহমেদ ইউএনবিকে জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন পঞ্জিকার সময়ের

আগেই বর্ষকাল শুরু হয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বোরো ফসল কাটার মৌসুমে (এপ্রিল-জুন) ভারি বৃষ্টিতে হাওরগুলো আরো বেশি করে জলমগ্ন হয়ে পড়বে। সেই সঙ্গে আগাম বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে বোরো উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যাপকভাবে। খবরে বলা হয়, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় ৫৭টি হাওর দেশের বোরো ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ শস্য নষ্ট হয়। এমদাদ উদ্দিনের মতে, জলবায়ু যেভাবে বদলে যাচ্ছে, তাতে কৃষকরা সময়মতো চাষ শুরু করলেও ফসল তোলা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। পাহাড়ি এলাকায় ভারি বৃষ্টি হলেই বন্যায় তাদের ফসল তলিয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে ফসল বাঁচাতে হাওর রক্ষাবাঁধগুলোর উচ্চতা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ হাওর এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখনকার তুলনায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়বে। হাঠাৎ ভারি বৃষ্টির কারণে আগাম বন্যাও বাড়বে। হাওর এলাকার নিকটবর্তী ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বছরে প্রায় ১৪ হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামী দিনগুলোতে আসাম ও মেঘালয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরো বাড়বে। সেই বৃষ্টির পানি পাহাড়ি ঢল হয়ে নেমে আসবে বাংলাদেশের হাওরগুলোতে। বৃষ্টিপাত বাড়লে ২০৫০ সাল নাগাদ ওই অঞ্চলের নদীগুলোর পানির উচ্চতা দশমিক ৬ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। আর তাহলে বর্ষাকালে নেমে আসা পানি আর বেরোতে পারবে না। ফলে হাওরগুলোতে সৃষ্টি হবে স্থায়ী জলাবদ্ধতা। খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এস এম শেখ নেওয়াজ সাংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'বোরো মৌসুমে শস্য বাঁচাতে হলে হাওর রক্ষাবাঁধগুলোর উচ্চতা এক থেকে দেড় মিটার পর্যন্ত বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে উৎপাদিত ধানের একটি বড় অংশ আসে হাওরাঞ্চল থেকে। এ অবস্থায় আমরা হাওর এলাকার বোরো উৎপাদন নিশ্চিত করতে না পারলে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে বড় ধরনের খাদ্য সংকট দেখা দেবে।'

আইডাব্লিউএমের এক সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের হাওরগুলোর পানির উচ্চতা প্রাকবর্ষা মৌসুমে দশমিক ৩ থেকে দশমিক ৬ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জের কর্চার হাওরের পানির উচ্চতা দশমিক ৩ মিটার এবং সিলেটের জিলকর ও মৌলভীবাজারের কাওয়ারদীঘি হাওরের পানির উচ্চতা দশমিক ৬ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যাবে।

এ কারণে ইউএনবির ওই প্রতিবেদনে হাওর রক্ষাবাঁধগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধির

পাশাপাশি ডুবো বাঁধগুলোর নকশায় পারিবর্তন আনা এবং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে ছয় জেলার ৪৬টি হাওর রক্ষার জন্য ৩৬৭ কিলোমিটার ডুবোবাঁধ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিস্তৃত হাওর এলাকার ফসল বাঁচাতে আড়াই হাজার কোটি টাকার একটি সমন্বিত প্রকল্প নেওয়া প্রয়োজন।

বৈশাখে আগাম বন্যায় হাওরের ফসল তলিয়ে গেলেও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সেখানে সেচ দেওয়ার মতো পানি থাকে না নদ-নদীতে। অথচ কয়েক দশক আগেও ওই অঞ্চলের কোনো কোনো নদী দিয়ে সারাবছর বড় দোতলা লঞ্চ, কার্গো, স্টিমার চলাচল করত। আর তখন হাওর রক্ষায় কোনো বেড়িবাঁধও ছিল না। হাওরের পানি নিষ্কাশনের খালগুলোতে শুধু পানি আসার আগে বাঁধ দেওয়া হতো। সেটাও দিতেন এলাকার কৃষকরা নিজ উদ্যোগেই। তাতেই রক্ষা পেত হাওরের ফসল।

২০০৮ সালের ১ মে চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুড়ি উপজেলার বেশ কয়েকজন কৃষক ওই এলাকায় কোন কোন নদী ও খালে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পানি থাকে না বলে কী পরিমাণ জমি অনাবাদি থেকে যায় সে চিত্র তুলে ধরেছেন। যদিও সেচ সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল রক্ষার জন্য ওইসব নদী খননের প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ বলেছেন কি না তা অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা অংশ থেকে জানা যায়নি। কাছাকাছি সময়েই কয়েকটি এনজিওর উদ্যোগে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'জাতীয় হাওর সম্মেলন'। ওই সম্মেলনের সুপারিশে হাওর অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের বৃহৎ নদীগুলোর নাব্যতা রক্ষা যে পরিমাণ ব্যয়বহুল, হাওর এলাকার বেলায় ততটা নয়। বৈশাখে পাহাড়ি ঢলের চাপটা মূলত থাকে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, কংস, ধনু ও সোমেশ্বরী নদীতে। বেশিরভাগ হাওর তলিয়ে যায় প্রধানত সুরমা, ধনু ও কংস দিয়ে নেমে আসা পানির চাপে। নব্বইয়ের দশকে একবার কংসের মোহনার দিকে কয়েক কিলোমিটার ড্রেজিং করা ছাড়া এ পর্যন্ত ওই অঞ্চলের অন্য কোনো নদী খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ দরকার এসব নদীর উৎস থেকে খনন করা। মোহনার দিকে শুধু যেসব পয়েন্টে বেশি পলি জমে সে জায়গাগুলোতে খনন করলেই চলে। যেসব এনজিও হাওরাঞ্চলের সমস্যা নিয়ে কাজ করছে তারা এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা করে সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারে যে ওইসব নদী খননে কী পরিমাণ অর্থ দরকার আর এ খননের ফলে লাভের পরিমাণটা কতখানি। এভাবে হিসাব করে দেখাতে পারলে এ কাজে

অর্থের অভাব হবে বলে মনে হয় না।

হাওরাঞ্চলের প্রধান নদীগুলো খননের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। আর এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হলে এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলে ছোট নদী-নালা ও খাল-বিল স্থানীয় উদ্যোগে খনন করা সম্ভব হবে। এ কাজেও ভূমিকা রাখতে পারে বেসরকারি সংস্থাগুলো। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়ে তাকেও এ কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৯৯৯ সালে সরকার দেশের আটটি এলাকাকে পরিবেশগত বিবেচনায় স্পর্শকাতর অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছিল। অঞ্চলগুলোর মধ্যে আছে হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওর। পাখি, উদ্ভিদ ও মৎস্যসম্পদসহ পরিবেশ ও জববৈচিত্র্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক রামসার কনভেনশনের অধীনে 'রামসার' এলাকা হিসেবেও তালিকাভুক্ত করা হয় এ দুটি হাওরকে। স্পর্শকাতর এ হাওর এলাকায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো উন্নয়ন কার্যক্রম চালানোর অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। অনেক দেরীতে হলেও এ উদ্যোগ হাওরকে আরো বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষায় সহায়ক হবে।

হাকালুকি হাওরের অবস্থান মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায়। পাঁচটি উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তৃত এ হাওরের আয়তন ১৮১.১৫ বর্গকিলোমিটার। এ হাওরে বিল আছে ২৩৮টির মতো। এগুলো অনেক প্রজাতির দেশি মাছের প্রাকৃতিক আবাস। মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে, এ হাওর হলো মাদার ফিশারি। এখানে মিঠা পানির মাছ আছে ১৫০ প্রজাতির। আছে ১২০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ। এ হাওর টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোটুরিজম শিল্প বিকাশের অসাধারণ আধার।

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলার ছোট-বড় ১২০টি বিল নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর। ৪৬টি গ্রামসহ পুরো হাওর এলাকার আয়তন প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ২৮০২.৩৬ হেক্টর জলাভূমি। শীতের অতিথি পাখিদের 'স্বর্গরাজ্য' হিসেবে সারাদেশে পরিচিত এ হাওর। প্রতিবছর প্রায় ২০০ প্রজাতির লাখখানেক অতিথি পাখির অগমণ ঘটে এ হাওরে। আগে এ সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশি। বিশ্বের অনেক বিপন্নপ্রায় প্রজাতির পাখি শীতকালে অস্থায়ীভাবে আবাস গড়ে তোলে এ হাওরে। এক হিসাব মতে, এ হাওরে আছে ২০৮ প্রজাতির পাখি, ১৫০ প্রজাতির মাছ, ১৫০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ, ৩৪ প্রজাতির সরীসৃপ ও ১১ প্রজাতির উভচর প্রাণি। এখানকার আইর, চিতল, গাং মাগুর, বাইম, পাবদা, গুলশা মাছ খুবই সুস্বাদু। এ হাওরের শুধু মৎস্যসম্পদ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজস্ব আয় হয় ৭০ লাখ ৭৩ হাজার ১৮৪ টাকা। এ

হাওরের সব জমি এক ফসলি হলেও খুবই উর্বর, ফলে ফলন হয় ভালো। হাওরের অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি কান্দা নামে পরিচিত। একসময় কান্দাগুলো ছিল গাছপালায় পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষের অর্থলিপ্সা এবং কৃষিজমির প্রয়োজনে উজাড় করে ফেলা হয়েছে ওই প্রাকৃতিক বন। তারপরও অবশিষ্ট হিজল, করচ, বলুয়া বনতুলসী, নলখাগড়া মিলে যে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়েছে এ হাওরকে তা পর্যটকদের অকৃষ্ট করে সহজেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় এখানে পর্যটকদের আনাগোনা কম। তবে এ হাওরের কাছাকাছি ধর্মপাশা উপজেলার চাদরা, ডুবাইল, চর হাইজদারচক এবং নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার চর হাইজদা ও ডিঙ্গাপোতা হাওরকে বনায়নসহ পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা গেলে পর্যটন এলাকা হিসেবে এ অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

হাওরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান ইজারা প্রথা বাতিল করা জরুরি। কেননা বিল (হাওরের নিচু সামান্য অংশ) ইজারা নিয়ে প্রভাবশালী ইজারাদাররা কেবল ওই বিলে মাছ ধরার অধিকারের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে বিশাল হাওরের তাবৎ জমি, জল, উদ্ভিদ, পাখিসহ সব সম্পদের মালিক বনে যায়। ২০০৯ সালে প্রণীত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় 'জাল যার জল তার' নীতি অনুসরণের কথা উল্লেখ থাকলেও এই নীতি বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। সাধারণভাবে দেখা যায়, বর্ষা মৌসুমে ইজারাদাররা তাদের লিজ নেওয়া বিলের সীমানার বাইরেও বিস্তৃত হাওরজুড়ে দখলদারিত্ব কায়েম করে। এ কাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বের প্রশ্রয় পায় তারা। এর ফলে ইজারাদাররা এতোটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, হাওরের ভাসান পানিতে (সরকারিভাবে ইজারা দেওয়া বিলের বাইরের উন্মুক্ত জল) সাধারণ জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা সংশ্লিষ্ট জমির মালিকরাও নিজেদের জমির কাছে ঘেঁষতে পারেন না। ২০১১ সালের ১৩ অক্টোবর রাতে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় নাইন্দাবাইন্দা জলমহালের ইজারাদার বাহিনীর হাতে খুন হন উপজেলার মাহমুদনগর গ্রামের আবুল হোসেন। এলাকাবাসী রাতেই তিন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। আটক ব্যক্তিরা হলো ওই জলমহালের ইজারাদার আবদুর রাজ্জাকের ছেলে রোসেল মিয়া, জামালগঞ্জ উপজেলার কালিপুর গ্রামের সোনফর মিয়ার ছেলে রিপন এবং ধর্মপাশার লংকা-ফাতারিয়া গ্রামের জজ মিয়ার ছেলে সাদ্দাম হোসেন। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রের বরাত দিয়ে ১৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্মপাশার নাইন্দাবাইন্দা জলমহালের ইজারাদার জামালগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সুখাইর-

রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের মাহমুদনগর গ্রামের আবুল হোসেনের ওই জলমহালসংলগ্ন 'মারাজের কুড়' (ডোবা) নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১১টার দিকে ওই ডোবার মালিক আবুল হোসেন ও তার ছেলে রানা মিয়া ডোবাটি পাহারা দিচ্ছিলেন। ওই সময় নাজেল মিয়া ও রোসেল মিয়ার নেতৃত্বে ছয়-সাতজন একটি ট্রলার যোগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের আটক করে। আবুল হোসেনের হাত-পা বেঁধে পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলে। তার ছেলে রানা মিয়ার চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন ট্রলার ও নৌকা নিয়ে আবুল হোসেনের লাশ উদ্ধার করে এবং হামলাকারী তিন ব্যক্তিকে আটক করে। খবর পেয়ে পুলিশ পরদিন সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং জনতার হাতে আটক তিনজনকে থানায় নিয়ে যায়। কোনো কোনো হিংস্র-লুটেরা ইজারাদার এমনকি শুকনো মৌসুমেও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে জোর করে মাছ ধরে নিয়ে যায়। হাওরের জলাশয় ও মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন এবং কৃষক ও মৎস্যজীবীদের অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে এই দস্যুতামূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি।

পরিশিষ্ট

কালপঞ্জি : জলবায়ু বদলের ঘটনা উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও রাজনৈতিক কর্মসূচি

১৭১২ : ব্রিটিশ লোহার কারবারি টমাস নিউকোমেন প্রথম স্টিম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন, পরে যার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তার এ উদ্ভাবন শিল্প-কারখানায় অধিক হারে কয়লা ব্যবহারের পথ সুগম করে।

১৮০০ : বিশ্বের জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছায়।

১৮২৪ : ফরাসি পদার্থবিদ জোসেফ ফুরিয়া পৃথিবীর স্বাভাবিক 'গ্রিনহাউস প্রভাব' ব্যাখ্যা করেন এভাবে– 'পৃথিবীর তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলের অবস্থানের কারণে বেড়ে যেতে পারে। কারণ তাপ আলোক অবস্থায় বায়ু ভেদ করতে যতটা বাধাগ্রস্ত হয়, ফিরতি পথে রূপান্তরিত অনুজ্জ্বল তাপ হিসেবে তার থেকে বেশি বাধাগ্রস্ত হয়।

১৮৬১ : আইরিশ পদার্থবিদ জন টিনডাল প্রমাণ করেন, জলীয় বাষ্প এবং অন্য কিছু নির্দিষ্ট গ্যাস গ্রিনহাউস প্রভাব তৈরি করে।

১৮৮৬ : কার্ল বেন্‌জ প্রথমবারের মতো 'মোটরভাগেন' জনসম্মুখে নিয়ে আসেন। সাধারণত একেই প্রথম সত্যিকারের মোটরগাড়ি বলা হয়।

১৮৯৬ : সুইডিশ রসায়নবিদ ভানতে আরহেনিয়াস (Svante Arrhenius) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিল্পায়নের যুগে কয়লার ব্যবহার স্বাভাবিক গ্রিনহাউস প্রভাব বাড়িয়ে দেবে। তিনি ধারণা করেন, এটা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

১৯০০ : আরেকজন সুইডিশ, নাট আংস্ট্রম (Knut Angstrom), বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত সামান্য ঘনমাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইড যে বর্নালীর অবলোহিত অংশগুলো ব্যাপকভাবে শুষে নেয় সে ঘটনা আবিষ্কার করেন। যদিও এই আবিষ্কারের তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারেননি, তবুও তিনি প্রমাণ করেন, খুব সামান্য গ্রিনহাউস গ্যাসও উষ্ণায়ন ঘটাতে পারে।

১৯২৭ : জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে এবং শিল্প-কারখানা থেকে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ বছরে ১০০ কোটি টনে পৌঁছে।

১৯৩০ : বিশ্বের জনসংখ্যা ২০০ কোটিতে পৌঁছে।

১৯৩৮ : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ১৪৭টি আবহাওয়া স্টেশনের রেকর্ড ব্যবহার করে ব্রিটিশ প্রকৌশলী গাই ক্যালেন্ডার প্রমাণ করে দেখান, পূর্ববর্তী ১০০ বছর জুড়েই পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে। তিনি আরো দেখান, পুরো সময়জুড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রাও বেড়েছে। একে তিনি উষ্ণায়নের কারণ বলে উল্লেখ করেন।

১৯৫৫ : প্রথম দিককার কম্পিউটারসহ নতুন প্রজন্মের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মার্কিন গবেষক গিলবার্ট প্লাস বিভিন্ন গ্যাসের অবলোহিত রশ্মি শোষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

১৯৫৭ : মার্কিন সমুদ্রবিজ্ঞানী রজার রেভেল এবং রসায়নবিজ্ঞানী হান্স সুস প্রমাণ করেন, অনেকের ধারণা মতোই বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত হচ্ছে তার সবটুকুই শুষে নেবে না সাগর।

১৯৫৮ : নিজের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চার্লস ডেভিড (ডেভ) কিলিং হাওয়াইর মাওনা লোয়া ও অ্যান্টার্কটিকায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের প্রণালীবদ্ধ পরিমাপ শুরু করেন। চার বছরের মধ্যে প্রকল্পটি প্রমাণ করে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বাড়ছে।

১৯৬০ : বিশ্বের জনসংখ্যা ৩০০ কোটিতে পৌঁছে।

১৯৬৫ : মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি উপদেষ্টা কমিটি হুঁশিয়ার করে বলে যে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব একটি 'বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ' বিষয়।

১৯৭২ : স্টকহোমে জাতিসংঘের প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তন সামান্যই গুরুত্ব পায়। রাসায়নিক দূষণ, পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা আর তিমি শিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আলোচনা। পরিণতিতে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) গঠিত হয়।

১৯৭৫ : বিশ্বের জনসংখ্যা ৪০০ কোটিতে দাঁড়ায়।

১৯৭৫ : মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়ালেস ব্রোকার তার এক গবেষণাপত্রের শিরোণাম 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন' দিয়ে শব্দ দুটিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে আসেন।

১৯৮৭ : বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে উন্নীত হয়।

১৯৮৭ : ওজোনস্তরের ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে সই হয় মন্ট্রিল প্রটোকল। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করে এ চুক্তি হয়নি, তবু এটা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ওপর কিয়েটো প্রটোকলের চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

১৯৮৮ : জলবায়ু পরিবর্তনের আলামত সংগ্রহ ও মূল্যায়নের জন্য জাতিসংঘের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তঃ সরকার পরিষদ (আইপিসিসি) গঠন করা হয়।

১৯৮৯ : রসায়ন শাস্ত্রে ডিগ্রিধারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার জাতিসংঘে এক বক্তৃতায় সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আমরা লক্ষ্য করছি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিপুল পরিমাণে বাড়ছে।... এর পরিণতি হলো ভবিষতে মৌলিক ও বহুবিস্তৃত পরিবর্তন, যা এ যাবতকালে আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে।' তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী ঐকমত্যের আহ্বান জানান।

১৯৮৯ : জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো এবং শিল্প-কারখানা থেকে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ বছরে ৬০০ কোটি টনে পৌঁছে।

১৯৯০ : আইপিসিস প্রথম প্রতিবেদন তৈরি করে। এতে বলা হয়, পূর্ববর্তী ১০০ বছরে পৃথিবীর উষ্ণতা ০.৩ থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। মানুষের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবে তা যুক্ত হয় এবং নিশ্চিতভাবেই এই সংযুক্তি উষ্ণায়ন ঘটাবে।

১৯৯২ : ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে বিশ্ব নেতাদের শীর্ষ বৈঠক হয়। সেখানে সরকারগুলো জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি সমঝোতা কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ ছিল 'জলবায়ু ব্যবস্থায় মানুষের মারাত্মক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা যাতে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনমাত্রা একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থিতিশীল রাখা যায়।' উন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার ১৯৯০ সালের মাত্রায় নামিয়ে আনতে সম্মত হয়।

১৯৫৫ : আইপিসিসি তার দ্বিতীয় প্রতিবেদনে 'পৃথিবীর জলবায়ুর ওপর মানুষের প্রভাবের একটি নির্ভরযোগ্য' পরিমাপ প্রস্তাব করে। এতে প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী করা হয়।

১৯৯৯ : কিয়োটো প্রটোকল অনুমোদন পায়। উন্নত দেশগুলো নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপক ভিন্নতাসহ ২০০৮-১২ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন গড়ে ৫ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। মার্কিন সিনেট তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়, তারা এ চুক্তি অনুমোদন করবে না।

১৯৯৮ : বৈশ্বিক উষ্ণতার সঙ্গে শক্তিশালী 'এল নিনো'র প্রভাব যুক্ত হয়ে বছরটিকে উষ্ণতম বছরে পরিণত করে। এ বছর গড় তাপমাত্রা ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার চেয়ে ০.৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

১৯৯৮ : বিতর্কিত 'হকি স্টিক' গ্রাফ প্রকাশিত হয় যাতে উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে গত এক হাজার বছরের তুলনায় স্বাভাবিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে মার্কিন কংগ্রেসের উৎসাহে এটি দু'দফা তদন্তের বিষয় হয়ে ওঠে।

১৯৯৯ : বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০০ কোটিতে উন্নীত হয়।

২০০১ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ যুক্তরাষ্ট্রকে কিয়োটো প্রটোকল নিয়ে আলোচনার প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে নেন।

২০০১ : আইপিসিসি তার তৃতীয় প্রতিবেদনে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উষ্ণায়নের পেছনে 'নতুন এবং আরো জোরালো প্রমাণ' তুলে ধরে, আর এজন্য মানুষের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে।

২০০৫ : কিয়োটো প্রটোকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবশিষ্ট দেশগুলোর জন্য এটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়।

২০০৬ : স্টার্ন রিভিউ এই সিদ্ধান্তে আসে যে জলবায়ু পরিবর্তনকে অনিয়ন্ত্রিত রেখে দিলে বিশ্ব জিডিপির ২০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। অথচ এর রাশ টেনে ধরতে ব্যয় হবে বিশ্ব জিডিপির এক শতাংশেরও কম।

২০০৬ : জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো এবং শিল্প-কারখানা থেকে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ বছরে ৮০০ কোটি টনে পৌঁছে।

২০০৬ : আইপিসিসির চতুর্থ প্রতিবেদনে বলা হয়, আধুনিককালে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষের তৎপরতা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৯০ শতাংশের জন্য বেশি দায়ী।

২০০৭ : আইপিসিসি এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আল গোর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। মানুষের কারণে জলবায়ু বদল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে অবদান রাখা এবং এবং এ ধরনের পরিবর্তন রোধ করতে পুরো সামর্থ নিয়োজিত করার জন্য তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

২০০৭ : বালিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আলোচনা সভায় সরকারগুলো ২০০৯ সালের শেষ নাগাদ একটি নতুন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য দুই বছর মেয়াদী 'বালি রোডম্যাপ'-এ সম্মত হয়।

২০০৮ : পর্যবেক্ষণ শুরুর অর্ধ শতক পর মোনা লোয়ায় কিলিং প্রকল্প জানায়, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা ১৯৫৮ সালে যেখানে ছিল প্রতি ১০ লাখে ১৩৫ ভাগ সেখানে ২০০৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৮০ ভাগে।

২০০৯ : বিশ্বের সর্বাধিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায় চীন। যদিও মাথাপিছু নির্গমনের হিসাবে এখনো বেশ এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র।

২০০৯ : ১৯২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান কোপেনহেগেনে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক শীর্ষসম্মেলনে সমবেত হন।

তথ্যসূত্র _____

বিবিসি বাংলার ওয়েবসাইট

পরিভাষা

অ্যাডাপটেশন : বাংলা প্রতিশব্দ অভিযোজন; যেসব পদক্ষেপের ফলে পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়। যেমন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বাড়তে থাকলে উপকূল বরাবর বাঁধ নির্মাণ। অথবা বন্যা কিংবা খরা সহ্য করতে পারে এমন ধরনের ধান চাষ করা।

অ্যানথ্রোপজেনিক ক্লাইমেট চেঞ্জ : মানুষের কারণে পরিবেশের পরিবর্তন। প্রাকৃতিক কারণে নয় মানুষের যেসব কাজের জন্য পরিবেশ বদলে যায়।

অ্যাটমসফেরিক অ্যারোসল : বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকে ভাসতে থাকা অতিক্ষুদ্র কণা যার কারণে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। এসব কণার কারণে পৃথিবীর ওপর শীতল প্রভাব পড়ে এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি টের পাওয়া যায় না।

বালি অ্যাকশন প্ল্যান : ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে ২০০৭ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে নিয়ে এ বৈঠকে একটি বিশেষ গ্রুপ গঠন করা হয়।

বালি রোডম্যাপ : ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে জাতিসংঘ আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তৈরি চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষে পরবর্তী কোপেনহেগেন শীর্ষসম্মেলনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের তাগিদ দেওয়া হয়।

বেসলাইন ফর কাটস : গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনার উদ্দেশে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে বিভিন্ন দেশ যে বছর থেকে হিসাব কষে। যেমন, কিয়োটো প্রটোকল ১৯৯০ সালের হিসাবকে বেসলাইন হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে কোনো কোনো দেশ আরো পরে এই বেসলাইন নির্ধারণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ২০০৫ সালের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রাকে বেসলাইন বলে মেনে নেয়।

ব্ল্যাক বা কালো কার্বন : জীবাশ্ম জ্বালানি, কাঠ, গোবর ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে না পোড়ার ফলে যে কালো ঝুল বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা

বাড়িয়ে দেয় যে ক'টি উপাদান, এটি তার মধ্যে অন্যতম।

ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড : কোন্ দেশ কী পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করতে পারে তার অনুমতিপত্র কেনাবেচার ব্যবস্থা। কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠান চাইলে অন্য দেশের কাছ থেকে তাদের অ্যালাওয়েন্স নগদ অর্থের বিনিময়ে কিনতে পারে। তবে এই অ্যালাওয়েন্সের একটি সর্বোচ্চ মাত্রা রয়েছে যাকে বলা হয় ক্যাপ।

কার্বন ডাই-অক্সাইড : বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায় এমন একটি গ্যাস। এটি স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়। আবার মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও (যেমন কয়লা পোড়ানো) তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের মধ্যে এটি অন্যতম।

কার্বন ইনটেনসিটি : পরিমাপের একক। মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন অনুযায়ী কোন্ দেশ কী পরিমাণ কার্বন তৈরি করে।

কার্বন লিকেজ : এমন একটি সমস্যা যেখানে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এমন একটি দেশে সরিয়ে নেওয়া হয় যেখানে কার্বন গ্যাস নির্গমণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তেমন কঠোর নয়।

কার্বন নিউট্রাল : এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হয় শূন্য শতাংশ। যেমন : কাঠ পোড়ালে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ে আবার গাছ লাগালে তারা কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয় । এতে ফল হয় শূন্য।

কার্বন অফসেটিং : বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমানোর লক্ষে পদক্ষেপ নেওয়া বা কোনো উদ্যোগে অর্থায়ন করা।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট : একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠন যে পরিমাণ কার্বন তৈরি করে; অথবা একটি পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কার্বন উৎপন্ন হয়।

সিএফসি : ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের সংক্ষিপ্ত নাম। একই পরিবারের কতগুলো গ্যাস যেগুলোর কারণে বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্ষয় হয়। এরা গ্রিনহাউস গ্যাস নামেও পরিচিত।

ক্লিন কোল টেকনোলজি : এমন এক প্রযুক্তি যার মধ্য দিয়ে কয়লা পোড়ানো হলেও সেই কয়লা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হবে না। এই প্রযুক্তির

ব্যাপক ব্যবহার শুরু হতে আরো এক দশক লাগবে।

ক্লাইমেট : বাংলা প্রতিশব্দ জলবায়ু; কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের দৈনন্দিন আবহাওয়ার সাধারণ বা গড় অবস্থা। জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ ইত্যাদি।

ক্লাইমেট চেঞ্জ : বাংলা প্রতিশব্দ জলবায়ু পরিবর্তন; বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধাঁচ। গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের মাপকাঠিতে এর পরিমাপ করা হয়।

ডিফরেস্টেশন : বাংলা প্রতিশব্দ বনউজার; বনাঞ্চলের স্থায়ী বিনাশ, যে কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে।

এনভায়রনমেন্ট : বাংলা প্রতিশব্দ পরিবেশ; কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের ওপর ক্রিয়াশীল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাববিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান।

ইকোসিস্টেম : গাছপালা, পশু-পাখির সঙ্গে তাদের প্রাণহীন পরিপার্শ্বের পারস্পরিক ক্রিয়া।

ফসিল ফুয়েল : কয়লা, তেল বা গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে হাইড্রোকার্বন। পৃথিবীর বুকে কয়েক লাখ বছর ধরে এগুলো তৈরি হয়। এগুলো পোড়ালে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড।

গ্রিনহাউস : নাজুক (ফুল ও সবজি) উদ্ভিদ ফলানোর জন্য শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত কাঁচের ঘর। বিকিরিত সূর্যতাপ কাঁচের ভেতরের জিনিসপত্র, কাঠামো ও মাটিকে তপ্ত করে। পরে কাঁচের ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র অবলোহিত (infrared) বিকিরণ ঘটায়। এসব দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিকিরণ কাঁচের বাধা অতিক্রম করতে না পেরে গ্রিনহাউসের ভেতরেই থেকে যায়। এভাবে বিকিরিত শক্তি গ্রিনহাউসে ঢুকে ভেতরের উপাদানগুলোকে তপ্ত করলেও সহজে বেরিয়ে যেতে না পারায় গ্রিনহাউস সহনীয় মাত্রায় উষ্ণ থাকে এবং ভেতরে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে।

গ্রিনহাউস ইফেক্ট : গ্রিনহাউসে যেমন ঘটে তেমনিভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে বাড়ে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং : গত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগতভাবে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা

বৃদ্ধি। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের কর্মকাণ্ড থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ফলেই এই তাপমাত্রা বাড়ছে।

আইপিসিসি : ইন্টার-গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ; জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি একটি প্যানেল। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে এই প্যানেল।

কিয়োটো প্রটোকল : জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় একটি চুক্তি, যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমানোকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে এই চুক্তি গৃহীত হয়। তবে ২০০৫ সালের আগে এই চুক্তিকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

মিটিগেশন : বাংলা প্রতিশব্দ প্রশমন; যেসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে মানুষের তৈরি কারণগুলোকে কমিয়ে আনা যায়। এসবের মধ্যে আছে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমণ হ্রাস এবং বায়ুমণ্ডল থেকে এসব গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে আনা।

নন-অ্যানেক্স ওয়ান কান্ট্রি : যেসব উন্নয়নশীল দেশ কিয়োটো প্রটোকল সই এবং অনুমোদন করে। তবে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর ব্যাপারে এদের ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই।

পার ক্যাপিটা ইমিশন : জনসংখ্যার আনুপাতিক বিচারে একটি দেশ সর্বমোট যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি ও নির্গমন করে।

ওয়েদার : বাংলা প্রতিশব্দ আবহাওয়া; তাপমাত্রা, মেঘের বিস্তার, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতি ইত্যাদির বিচারে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা। জলবায়ু থেকে এটি ভিন্ন, কারণ দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে গড় আবহাওয়াকে বলা হয় জলবায়ু।

তথ্যসূত্র _____

বিবিসি বাংলার ওয়েবসাইট